সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

বইমেলায় হিন্দুত্ববাদী প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাল আহমেদিয়া নেতারা ▯ ৯

নিশাকর সোম : আমাদের শ্রদ্ধা ও স্মরণ ▯ ১০

খোলা চিঠি : মা-মাটি-জলসা, ত্রিস্তর মন্ত্রিসভা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

বিবেকানন্দ-ময়রার দোকান ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ১২

পাকিস্তানের অপকর্ম ও ভারত ▯ নীতিন রায় ▯ ১৪

পর্দার আড়ালে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রক আমেরিকা, আল্লাহ আর আর্মি ▯ রথীন রায় ▯ ১৬

কাকচক্ষু বিশারদ ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২১

ঐতিহাসিক : গোয়ালিয়র ▯ সোমশুভ্র চক্রবর্তী ▯ ২২

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

অঙ্গনা : সোনার সাতকাহন ▯ বিদিশা ভট্টাচার্য ▯ ২৬

বালুচিস্তান কি পূর্ব পাকিস্তানের পথে? ▯ মুজফ্‌ফর হোসেন ▯ ২৭

গুজরাটের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ ▯ তারক সাহা ▯ ২৯

একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধীদের অব্যাহতির চেষ্টা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়েছে ▯ ৩১

কিছু কি শিক্ষা নিতে পারছেন জনাব? ▯ সঞ্জীব বাগচী ▯ ৩২

সুস্বাস্থ্য : মুদ্রার প্রকারভেদ (২য় পর্ব) ▯ আশীষ পাল ▯ ৩৫

খেলা : সমাজে বিলুপ্ত ক্রীড়া সংস্কৃতি ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ ▯ ভাবনা-চিন্তা : ২০ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮ ▯

▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ৬ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১৮ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ - ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
২৫ ফেব্রুয়ারি
২০১৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৫ ফেব্রুয়ারি
২০১৩

নারী সম্মানের চেয়ে নারী স্বাধীনতা জরুরি ?

সম্প্রতি দিল্লীতে এক যুবতীর গণধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশ প্রতিবাদ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সম্মান রক্ষার বিষয়টি নতুন করে উঠে এসেছে। এই নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

লিখেছেন — **এন সি দে, সাধন কুমার পাল**

।। সত্বর কপি বুক করুন।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

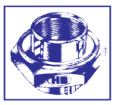

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE ® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আফজলের ফাঁসি এবং কিছু প্রশ্ন

অবশেষে গণতন্ত্রের পীঠস্থানে নারকীয় সন্ত্রাসের পর দীর্ঘদিন কালক্ষেপ করিয়া শেষ পর্যন্ত কার্যকর হইল মহম্মদ আফজল গুরুর ফাঁসির সাজা। অবশ্য মৃত্যু দণ্ড বিলম্বিত হইবার কোনও কারণ দর্শাইতে পারে নাই সরকার। জনমতের চাপেই, অবশেষে আইন মোতাবেক পদক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল প্রশাসন। ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে বিলম্ব লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে বারবার। কারণ আফজল গুরুর বিচার শেষ হইয়া গিয়াছিল ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে। তাহার পর হইতেই ফাঁসির নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা লইয়া লাগাতার টালবাহানা চলিতেছিল। সংসদ আক্রমণের ষড়যন্ত্রে আফজল গুরুর জড়িত থাকিবার প্রমাণ ছিল অত্যন্ত জোরালো। তাই জাতীয় ভাবাবেগের কথা মাথায় রাখিয়া তাহার মতো একজন সন্ত্রাসবাদীকে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও দণ্ড ছিল কি? তবুও তাহাকে ফাঁসির মঞ্চে চড়ানো লইয়া এত বিলম্বের কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক মহলের ধারণা এইরকম কিছু মাস্টার স্ট্রোক অর্থাৎ চমক দিয়া কংগ্রেস নিজেদের পালে হাওয়া জোরদার করিয়া নিতে চায়। এবং তাহা কাজে লাগাইয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হইতে চায়। কিন্তু দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধির মতো সমস্যাগুলির কি হইবে। কাসব ও আফজল গুরুর ফাঁসির পর দেশের আমজনতা ইউপিএ সরকারের যাবতীয় দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতার কাহিনী ভুলিয়া গিয়া ক্ষমা করিয়া দিবে এমন দুরাশার বাস্তব কোনও ভিত্তি নেই। আসলে মোদীর নেতৃত্ব লইয়া কংগ্রেস ভয় পাইয়া গিয়াছে। মোদীর উন্নয়নের সাফল্য বিশেষ করিয়া গুজরাটের উন্নয়নে তাঁহার রেকর্ডের কাছে কংগ্রেস ভোটের পূর্বেই পরাজিত। তাই কম সময়ের মধ্যে উপর্যুপরি দুইজন সন্ত্রাসবাদীকে ফাঁসি দিয়া কংগ্রেস দেখাইতে চাহিতেছে এই দলটি হিন্দু হিতের পক্ষে কতটা একনিষ্ঠ সেবক। আসলে আই এস আই, লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে একসুরে 'গেরুয়া সন্ত্রাস' লইয়া কাল্পনিক অভিযোগে অভিযুক্ত কংগ্রেস এক কুখ্যাত জঙ্গীকে ফাঁসি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে মাত্র। দেশের মানুষের মন হইতে কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি, টুজি কাণ্ড, দুর্নীতি, দিল্লী গণধর্ষণ কাণ্ডের ছবিগুলি মুছিয়া ফেলিতে উদ্যোগ লইয়াছে কংগ্রেস। কিন্তু মানুষের মন হইতে এইসব অপকীর্তি মুছিবার নয়। অবশ্য কংগ্রেস বলিতেছে তাহাদের হাতে নাকি তুরুপের তাস রহিয়াছে যাহাতে মানুষ কংগ্রেসের সব অপকীর্তি ভুলিয়া যাইবে। নিজেদের কেলেঙ্কারি ঢাকিতে কংগ্রেস গুরুত্ব দিতেছে আধার কার্ডের ভিত্তিতে গরীবদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি নানা প্রকল্পে টাকা পাঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্তে। ইন্দিরা গান্ধী 'গরিবী হঠাও' কর্মসূচী ঘোষণা করিয়া দেশের গরীব মানুষকে নিধনের ব্যবস্থা পাকা করিয়াছিলেন। আজ গরীব মানুষকে ঘুষ দিয়া দেশকে বেচিয়া দিবার পরিকল্পনা করিতেছে কংগ্রেস। এই জন্য খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই, জমি অধিগ্রহণ বিল, বিমা ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। কংগ্রেসের আশা কাসব-আফজল গুরুকে ফাঁসি দিবার ফলে বর্ণ হিন্দুর সব ভোট তাহারা ইতিমধ্যেই পকেটে ভরিয়া ফেলিয়াছে, আবার নিজেদের সেকুলার মুখোস পরিয়া মুসলমান ভোট আদায় করাও সম্ভব হইবে। ওমর আবদুল্লা যাহা বলিতেছেন তাহা নিজের দলের ভোট আদায়ের জন্য। তবে এই ফাঁসি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতা পদে পদে প্রকটিত হইতেছে। যাহার জন্য বিতর্ক উঠিতেছে এবং সেই বিতর্ক সামাল দিবার অক্ষমতা চলিতেছে।

সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা আফজল গুরুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ওমরের দল ন্যাশনাল কনফারেন্স ইউপিএ-র শরিক। কংগ্রেস ওমরের এই অবস্থান সমর্থন করিতেছে কিনা তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইবার দায়িত্বও তাই কংগ্রেসের।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?—নানাবিধ জ্ঞানার্জন?—তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝা, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় তথাকথিত অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ভোজন করলেন সাধু-সন্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মহাকুম্ভ মেলা প্রকৃত অর্থে জনসমুদ্র। ভক্তিমান ভক্তিমতীরা দলে দলে আসছেন। প্রথা মেনে আনুষ্ঠানিকভাবে সব আচার পালনের মধ্যেও গত ৭ ফেব্রুয়ারি দেখা গেল একেবারে সম্পূর্ণ অন্য

মানবিক ছবি। একসময় সমাজ অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা অবহেলা করেছে মলবাহকদের। তাঁদের অনুষ্ঠানের আঙিনায় ডাকা হয়েছে মুক্ত চিত্তে সব বিধিনিষেধের গণ্ডি ভেঙে দিয়ে। তাঁরা এসেছেন সমবেতভাবে। সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। পুজো দিয়েছেন। একসঙ্গে বসে খাবার খেয়েছেন উচ্চবর্ণ ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর আগে কর্ণাটকের উদীপিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠকে পূজ্য সাধুসন্তরা ঘোষণা করেছিলেন— ন হিন্দু পতিতো ভবেৎ। কোনও হিন্দুই পতিত বা অস্পৃশ্য নয়।

রাজস্থানের আলোয়ার আর টঙ্ক জেলার একশোজন মহিলা শুধু পুজো করেননি, মেলার অঙ্গনে স্বামী নরেন্দ্র গিরির ভগবানবাড়ি আখড়ার ভিতরে হাজার হাজার ধর্মগুরু মোহান্তদের সঙ্গে বসে ভোজন করেছেন। হরিদ্বার বারাণসী এলাহাবাদের সংস্কৃত পণ্ডিত ও সাধুরা সঙ্গমে তাঁদের সাহায্য করেছেন সব অনুষ্ঠানে।

কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে যে প্রথা চলছিল তা থেকে সরে এসে এমন উৎসবের দিনে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনস্থলে যা ঘটল তা সম্পূর্ণ অভিনব। হৃদয়ের সবকটা দ্বার খুলে দেওয়ার আত্মিক তাগিদ দেখা গেল।

এলাহাবাদ থেকে আসা উষা বলেন, এটা তো আমার কাছে পুনর্জন্মের মতো। যখন দেখলাম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধু মহারাজরা আর সংস্কৃত পণ্ডিতরা আমাদের আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন, আমরা সমাজেরই অঙ্গ এটা বলতে চেয়েছেন, এটা একটা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। পুণ্যতোয়া গঙ্গা এই পবিত্র শহরে আমাদের আশীর্বাদ করেছে।

আবেগে আনন্দে কথা বলতে পারছিলেন না নিরালা। বললেন, আমার অনুভূতি ব্যাখ্যা করা কঠিন।

বহুকাল ধরে এমন একটা দিনের জন্যে অপেক্ষা করেছি। আমরা বহু পথ পেরিয়ে এসেছি সাধুদের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্যে। যে অভিজ্ঞতা হলো তা গ্রামে ফিরে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবো। এমন একটা ঘটনার পিছনে রয়েছেন একজন মানুষ। বিন্ধেশ্বর পাঠক। যিনি স্বল্প ব্যয়ে সুলভ শৌচালায় আন্দোলন ও উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একসময় যারা মাথায় করে বিষ্ঠাপাত্র বইত তারা— সেইসব তথাকথিত অস্পৃশ্যরা আমাদের সমাজেরই অঙ্গ— একথা বলেছেন বিন্ধেশ্বর পাঠক। মলবহনের জঘন্য প্রথা বন্ধের জন্যে তিনি লড়াই চালিয়েছেন ১৯৭০ সাল থেকে। রাজস্থানের আলোয়ার আর টঙ্ক জেলা থেকে আসা মহিলারা এখনও মনুষ্যমল বহন করেন। তাদের সুলভ শৌচালয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শতাব্দী-প্রাচীন কুপ্রথা মুক্ত মহিলাদের সঙ্গে ভোজনের পর নিরঞ্জনী আখড়ার স্বামী বালানন্দ মহারাজ বলেছেন, এই উদ্যোগ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। কোনও ধর্মই অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে না। সামাজিক সমদৃষ্টির জন্যে সাধুসন্ত ও উচ্চবর্ণ শ্রেণীর মানুষের এগিয়ে আসা দরকার।

ডঃ নজরুল ইসলাম রচিত

মুসলমানের করণীয় পুস্তকের জবাবে

হিন্দুর করণীয়

নিত্যরঞ্জন দাস

মূল্য ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

কংগ্রেস ভরসায় ত্রিপুরা আগলাচ্ছেন মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সত্যি বলতে কী ত্রিপুরা নিয়ে কোনওকালেই মাথাব্যথা ছিল না পার্টির পলিটব্যুরোর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি ঘুচে যাবার পর এবং গত বিধানসভায় কেরলে পর্যুদস্ত হবার পর উত্তর-পূর্বের 'গুরুত্বহীন' রাজ্যটির গুরুত্ব সিপিএমের কাছে অকস্মাৎ বিপুল পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের প্রায় ভিখিরি সাজার উপক্রম। এরাজ্যে গত বিধানসভায় হলফনামা দাখিল করতে গিয়ে বুদ্ধবাবু যেমন নিজের সম্পত্তি বলতে কেবল হাজার পাঁচেক নগদ টাকার উল্লেখ করেছিলেন, মানিকবাবু তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের দাখিল করা হলফনামায় দেখা যাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর না আছে গাড়ি, না আছে বাড়ি। সম্পত্তি বলতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা মিনিমাম ব্যালেন্সটুকু, মাত্র হাজারখানেক টাকা মতো। মুখ্যমন্ত্রীর এই হাল হলে দীর্ঘ দু'দশক বামপন্থী শাসনে থাকা রাজ্যবাসীর কী হাল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া সিপিএম নেতাদের আর্থিক প্রতিফলন দেখে তা একেবারেই নয় বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। আর এখানেই কপালে ভাঁজ পড়েছে পলিটব্যুরোর। রাজ্যের যা বর্তমান রাজনৈতিক চালচিত্র তাতে সিপিএমের ভয় পাওয়ার বিশেষ কারণ নেই।

প্রথমত, ভাল সংগঠন এবং দ্বিতীয়ত, বিরোধীদের অপদার্থতাকে মূল ভিত্তি করে পঞ্চমবারের জন্য জেতার স্বপ্ন দেখছেন মানিক সরকার। কিন্তু সেই স্বপ্নের মাঝেই দুঃস্বপ্নের মতো উদয় হয়েছে দলীয় নেতাদের দুর্নীতি। এই দুর্নীতির কথা রাজ্যের একটা বাচ্চা ছেলে জানলেও পার্টির সর্বময় কর্তৃত্বে তা প্রকাশ হতে পারছে না বলে অভিযোগ। এর পেছনে কং-সিপিএম গটআপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে পার্টির নেতারা দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত থাকলেও প্রার্থী করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিষ্কলুষ ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিয়েছে। তথ্য-পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যে ১৬ জন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে কোটিপতি হিসেবে নিজেদের নাম নথিভুক্তি করেছেন তার মধ্যে ১২ জনই কংগ্রেসের, একজন মাত্র সিপিএমের।

অপরদিকে যে ১৯ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে তার মধ্যে ১৩ জনই কংগ্রেসের, একজন মাত্র সিপিএমের। আর এইসব পরিসংখ্যানই সিপিএমের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সাহায্য করেছে, যার পেছনে কংগ্রেসের অবদানও কম নয়। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, তৃণমূল সোনিয়া কংগ্রেসের হাত ছাড়ার পর জাতীয় রাজনীতিতে যে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে তার ফলে কংগ্রেস-সিপিএম কাছাকাছি আসছে। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর সিপিএম-কংগ্রেসকে আবার একাসনে দেখা যেতেই পারে। সেই সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতেই ত্রিপুরা বিধানসভার ভোটে সিপিএমকে কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন মদতের ইঙ্গিত উড়িয়ে দিতে পারছেন না রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বিশেষত কেরলে সিপিএম কংগ্রেসের মূল শত্রু হলেও পশ্চিমবঙ্গে এই দুই দলেরই যা হাল তাতে অদূর ভবিষ্যতে কারুরই ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গ, কেরল থেকে বিতাড়িত সিপিএম আপাতত সবচেয়ে বেশি এখন ভরসা করছে— না মার্কসকে নয়, মানিক সরকারকে। আর কংগ্রেসের ভরসায় বুঁদিগড় এবারও সামলানোর স্বপ্ন দেখছেন মানিক।

ওমরের সহানুভূতিকে তীব্র নিন্দা বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংসদ আক্রমণকারী সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর প্রতি সহানুভূতি সূচক কথা বলে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা উপত্যাকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে প্ররোচিত করছেন বলে বিজেপি তীব্র নিন্দা করেছে। শ্রী আবদুল্লা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আফজলের ফাঁসি নিয়ে বিজেপি অনেক কথা বললেও রাজীব গান্ধী, বিয়ন্ত সিং-এর হত্যাকারীদের নিয়ে নীরব কেন? এর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন বিজেপি নেতা বেঙ্কাইয়া নাইডু। বিজেপি দাবী জানিয়েছে, ওমরের এই অবস্থান কংগ্রেস সমর্থন করে কিনা তা জানাতে হবে কেননা ওমরের দল ইউপিএ সরকারের শরিক। বিজেপি মুখপাত্র প্রকাশ জাভেদকর বলেছেন, ওমর তার এই সাক্ষাৎকারে আফজল গুরুর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছেন, সে 'একজন ৪৩ বছেরর যুবক।' ওমর ভুলে গেছেন যে সংসদ আক্রমণে নিহত নয়জনের মধ্যে ছয়জনই বয়সে আফজলের থেকে ছোট। ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ ভবন আক্রমণকারী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর এই সহমর্মিতা অত্যন্ত নিন্দার যোগ্য। কাশ্মীরের যুবকরা আফজলের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম ভাবতে পারে— ওমরের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাভেদকরের পাল্টা প্রশ্ন, কাশ্মীরের যুবকদের দেশপ্রেম নিয়ে কেন এভাবে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

জাভেদকর আরও বলেছেন, সুপ্রীম কোর্টের রায়কেও মুখ্যমন্ত্রী ওমর চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। ওমরের দাবী, সুপ্রীম কোর্টের এই রায় পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের (সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স) ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে এবং সমাজের সামাগ্রিক বিবেককে সন্তুষ্ট করতেই উচ্চ আদালতের এই রায়।

বাংলার প্রথম মুখ্যশিক্ষক
জয়দেব ঘোষ চলে গেলেন

অজিত কুমার বিশ্বাস

গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাংলা প্রদেশের প্রথম শাখার প্রথম মুখ্যশিক্ষক জয়দেব ঘোষ পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘ পরিবারের সকলে শোকাহত।

বাংলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রথম শাখা আরম্ভ হয় কলকাতার মানিকতলায়। সেই শাখার প্রথম মুখ্যশিক্ষক ছিলেন জয়দেব ঘোষ। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিটে থাকতেন। প্রথমে নাম শুনেছিলাম জয়দেব ঢোলে। জয়দেবদা বলতেন, আমাদের পূর্বপুরুষ মহারাষ্ট্র থেকে এখানে এসেছে। জয়দেবদাদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল একটি মিষ্টির দোকান। নাগপুরে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ১৪তম বছরে ১৯৩৯ সালে সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস মানিকতলায় শাখা শুরু করেন। জয়দেবদার বাড়ির কাছেই 'তেল কলের মাঠে' প্রথম শাখা আরম্ভ হয়। এখন এই মাঠটি হলো রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের টেলিফোন ভবনের এবং জীতেন্দ্র নারায়ণ বিদ্যালয়ের পেছনে। ভাঙ্গাচোরা মাঠ বালকেরা মিলে পরিস্কার করে শাখা আরম্ভ করল। তখন কালিদাস বসুও ছিলেন ওই প্রথম দলে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারকে সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য জয়দেবদার হয়েছিল এই কলকাতায়। আমহার্ট স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের প্রশিক্ষণ শিবিরকে তখন বলা হোত ওটিসি এখন যাকে বলা হয় সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ। সেই ও টি সি-তে বালাসাহেব যে কয়েকজন স্বয়ংসেবককে কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন জয়দেবদা। সেই নাগপুর শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আদ্য সরসঙ্ঘচালক পুজনীয় ডাক্তার কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার। সেই শিবিরে ডাক্তারজী বাংলার স্বয়ংসেবকদের তাঁর প্রিয় গান 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'

গানটি গাইবার জন্য বলেছিলেন।

জয়দেবদা পরবর্তীকালে মানিকতলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। একটি ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার মানিকতলা, বাগমারি, গৌরীবাড়ী, উল্টোডাঙ্গা, বেলেঘাটা, কাঁকুড়গাছি অঞ্চলে সংঘের শাখার বিস্তার করেছিলেন। কিছুদিন প্রচারক হিসাবে পূর্ববাংলাতেও কাজ করছেন।

১৯৫৭-এ কলকাতায় এসে আমি প্রথম মানিকতলা প্রভাত শাখায় গিয়ে দেখা পাই জয়দেবদার। তখন মানিকতলা শাখা হোত বিষ্টুচরণ ঘোষের বাড়ির পেছনের মাঠে। যেটা এখনও শাখার মাঠ হিসাবে পরিচিত। ১৯৪০-৪৩ সালে মানিকতলা শাখার একজন প্রমুখ স্বয়ংসেবক ছিলেন পীযূষ কুমার মুখার্জী। এখন তাঁর বয়স ৯২। তিনিও বললেন, জয়দেব ছিল ভাল একজন কার্যকর্তা। কালিদা ও জয়দেবদার মৃত্যু তাঁকে খুবই দুঃখ দিয়েছে। পীযূষদা আরও বলেছিলেন, আমাদের শাখায় শ্রীগুরুজী তৎকালীন বাংলার প্রান্ত প্রচারক বিট্লরাও পাতকীর সঙ্গে এসেছিলেন। আমার সৌভাগ্য আমাদের বাড়িতে শ্রীগুরুজী পদার্পণ করেছিলেন।

মানিকতলা শাখা শুরু হবার পর কয়েক বছর একটা আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কেটেছে। ফলে সংঘের কাজ অন্যপ্রদেশের মতো বৃদ্ধি হয়নি। ১৯৩৯-এ বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলো। ১৯৪২-তে জাপানী বোমার ভয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকে কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। ১৯৪৩-এ কলকাতা শহরে ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দিল। ১৯৪৩-এর ক্ষত শুকোতে না শুকতে ১৯৪৬ কলকাতায় 'Great Calcutta Killing' আরম্ভ হলো। ৩০ হাজার লোক নিহত হলো সেই Killing-এ। তারপর দেশ স্বাধীন হলো, প্রায় সাথে সাথে সংঘকে শেষ করে দেবার জন্য ১৯৪৮-এর ৪ ফেব্রুয়ারি গান্ধী হত্যার অজুহাতে নেহরু সরকার সঙ্ঘকে বে-আইনী করে দিল। সঙ্ঘ এর প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করল। জয়দেবদা সেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। এই দুর্যোগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘ সব শক্তি নিয়ে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি' গড়ে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বিপন্ন মানুষদের মধ্যে সাহায্যের জন্য সঙ্ঘ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই বেসরকারী রিলিফ ও সহায়তার ক্ষেত্রে জয়দেবদা, কালিদা প্রমুখ স্বয়ংসেবকেরা একনাথ রানাডের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক কাজ করেছেন।

১৯৪৮-এ সঙ্ঘ-কে নিষিদ্ধ ঘোষণার পর ১৯৪৯-এ এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। সঙ্ঘ বিরোধী নেহরু কংগ্রেসের এই আদেশের বিরুদ্ধে বাংলায় সত্যাগ্রহ হয়। এই সত্যাগ্রহে ২০০০ স্বয়ংসেবক যোগ দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনে জয়দেবদা, কালিদা, রামদা (রামপ্রসাদ দাস), ঠেংড়ীজী, আবাজী থাট্টে, পাণ্ডুরঙ্গ ক্ষীরসাগর যোগ দিয়েছিলেন। এরপর বাংলার সঙ্ঘের কাজ শুরু হয় ১৯৪৯ সালে ১২ জুলাই-এর পর। সঙ্ঘ গান্ধী হত্যার মিথ্যা মামলা থেকে মুক্ত হয়। সারা উত্তর কলকাতায় তখন সংঘের কাজকে ছড়িয়ে দেবার কাজ করেছিলেন জয়দেবদা।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্বাঞ্চলের কার্যালয় 'কল্যাণ ভবন'-এর নির্মাণে সহায়তা করেছেন। তখন বামফ্রন্টের কিছু লোক এই কাজে বিরোধিতা করেছিল। কল্যাণ আশ্রম শুরু হবার পর সেখানে একটি সাপ্তাহিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। জয়দেবদা এই শাখার স্বয়ংসেবক হন।

শ্রী ভগবানের কাছে জয়দেবদার প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

বইমেলায় হিন্দুত্ববাদী প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাল আহমেদিয়া নেতারা

গূঢ়পুরুষের
কলম

সদ্য সমাপ্ত কলকাতা বইমেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর 'মমতাময়ী' রাজ্যের সংবাদ মাধ্যম অনাদরে অবহেলা করেছে। বইমেলায় আহমেদিয়া মুসলিমদের স্টলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাজ্য বিজেপি-র নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদল উপস্থিত থেকে পাকিস্তান ও সৌদি আরবে আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের উপর সুন্নিদের বর্বরতম অত্যাচার ও হত্যার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। পাকিস্তানে সম্প্রতি বাস থেকে নামিয়ে আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী, পুরুষ, শিশুদের গুলি করে হত্যা করেছে সুন্নি তালিবান ঘাতকরা। পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রেই আহমেদিয়া মুসলিমদের কাফের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বেগম জিয়ার প্রাক্তন সরকারের আমলে হিন্দু সংহারের মতোই সরকারি মদতে আহমেদিয়া ও বৌদ্ধদের খতম করাটা নিত্য কাজ ছিল মৌলবাদী সুন্নি মুসলমানদের। বাংলাদেশের উর্দুভাষী খুনি রাজাকার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক খান সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাভাষীদের নিধনে যোগ দিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয় হিন্দু বৌদ্ধ এবং আহমেদিয়া মুসলিমদের উপর। হিন্দুত্ববাদী প্রতিনিধিদলটিকে স্বাগত জানিয়ে আহমেদিয়া নেতারা জানান, বইমেলায় তাঁদের স্টল করতে না দেওয়ার জন্য সুন্নি মোল্লা মৌলবিরা মেলার উদ্যোক্তাদের উপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করেছিল। এমনকী তাদের ফতোয়া না মানলে নাশকতারও হুমকি দেয় তারা। উদ্যোক্তারা ভয় পেয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে সবকিছু জানিয়ে দেন। এরপরেই নড়েচড়ে বসেন লালবাজারের বড়কর্তারা। ফলে সুন্নিরা হুমকির পর আর এগোতে সাহস পায়নি।

গত দুই দশকের বেশি আহমেদিয়ারা বইমেলায় তাঁদের ধর্মীয় বইপত্র বিক্রির জন্য স্টল দিচ্ছেন। হঠাৎ এবার সুন্নি মৌলবি সাহেবরা ক্ষেপে গেলেন কেন? এই ক্ষিপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ, স্টলের প্রবেশদ্বারে ইসলামি ইষ্টমন্ত্র 'কলমা' বড় হরফে লেখাকে কেন্দ্র করে। সুন্নিরা বিশ্বাস করে, আল্লার শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসীদের 'কলমা' পড়ার বা জানার অধিকারই নেই। প্রকাশ্যে বড় বড় হরফে 'কলমা' লেখা থাকলে মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ বই প্রেমিক অ-মুসলমানরা ইসলামের গোপন ইষ্টমন্ত্র পড়ে ফেললে গোটা ইসলাম ধর্মটি বিপন্ন হবে। সৌভাগ্যের কথা বইমেলার উদ্যোক্তরা সুন্নিদের এমন তালিবানি আবদার মেনে নেননি।

ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণের

আহমেদিয়াদের স্টলে হিন্দু প্রতিনিধিরা।

অপব্যাখ্যা করে সুন্নি মৌলবিরা বলেন, একজন মুসলমান পুরুষ চারটি বিবি রাখতে পারে। দিল্লির সেশন কোর্ট সম্প্রতি স্পষ্ট রায় দিয়েছে যে কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করে চার বিবি নিকাহ করার কথা কিছু মতলববাজ মৌলবি প্রচার করেছে। ঘটনাটি এইরকম। দিল্লীর সেশন কোর্টে একটি মামলা ওঠে দিল্লী সরকার বনাম নাদিম খান নামে। নাদিম খান একজন সুন্নি মৌলবি। তাঁর স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্য একজন বিবাহিতা যুবতীকে নিকাহ করেন এবং ধর্ষণ করেন। এই মামলায় নাদিম খানের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানিয়ে বলেন, কোরান অনুযায়ী একজন মুসলমান পুরুষ চার বিবি রাখতে পারে। নাদিম খান কোরান মেনেই অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে নিকাহ করেছে। তাই এই কাজ অন্যায় নয়। দিল্লীর দায়রা আদালতের বিচারক ডঃ কামিনী লাউ ইসলামি ধর্ম বিষয়ে বিশ্বখ্যাত সুপণ্ডিত মহিলা। বিচারপতি ডঃ লাউ তাঁর রায়ে জানান, কোরানে বহুবিবাহের অনুমোদন থাকলেও বহুবিবাহকে বাধ্যতামূলক বলেনি বা উৎসাহ দেখায়নি। লালসা বা যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য কোরান একাধিক বিবাহের অনুমোদন দেয়নি। প্রধানত, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বিধবাদের সামাজিক নিরাপত্তা দিতেই এমন অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্যথা, এক বিবাহেই সংযত থাকতে হবে। তাই বহু বিবাহের ঢালাও অনুমোদন কোরানে আছে এমন কথা কোরানেরই অপব্যাখ্যা। ঠিক এই কারণেই মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক ও তিউনিশিয়ায় মুসলমানদের একাধিক বিবাহ আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকী সুন্নিদের দাপট যেখানে সবচেয়ে বেশি সেই পাকিস্তানেও ১৯৬১ সালে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বলা হয়েছে, কোনও পুরুষ নিজের খেয়ালখুশি মতো তিন তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না।

বিচারপতি ডঃ লাউ বলেছেন, সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতেই শরিয়ত আইনের অপব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়। কামিনী লাউ বলেছেন, ভারতে মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড একটি সমান্তরাল আইনি ব্যবস্থা যার কোনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। কেন এমন অবস্থা তার জবাব দেওয়ার দায় কেন্দ্রীয় আইন দফতরের। ভারতে মুসলিম মহিলাদের ভোটাধিকার থাকলেও মুসলিম সমাজে বা পরিবারে মহিলাদের খুব একটা মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। স্ত্রী স্বাধীনতা বস্তুটি কী আজও ৯৯ শতাংশ ভারতীয় মুসলিম মহিলা জানেন না। তাই আর কিছু না হোক দিল্লীর দায়রা জজ ডঃ কামিনী লাউ তাঁর রায়ের মাধ্যমে দেশের মুসলিম সমাজকে একটি কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, সাংবিধানিক স্বীকৃতিহীন মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড অবাধে চলে কীভাবে। প্রশ্নটি হলো, মুসলিম ধর্মীয় প্রধানদের কোরান এবং শরিয়তি আইনের অপব্যাখ্যা সাধারণ মুসলমানরা আর কতকাল সহ্য করবেন। সবিনয়ে বলি, প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় দেশের মুসলিম সমাজ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের।

নিশাকর সোম

আমাদের শ্রদ্ধা ও স্মরণ

চলে গেলেন নিশাকর সোম। স্বস্তিকায় আমাদের দীর্ঘদিনের সঙ্গী এবং 'রাজ্য-রাজনীতি' কলমের লেখক। এক নিপাট ভদ্র ভাল মানুষ। অত্যন্ত বিনয়ী নম্র। সল্টলেকের আমরিতে গত ৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বস্তিকায় 'রাজ্য রাজনীতি' কলমে গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিয়মিত লিখতেন। প্রথম জীবনে অন্য মতবাদে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো ধর্মীয় সংস্কৃতিতে আস্থা ফিরে পাওয়া। স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে এসে তাঁর উপলব্ধি হলো, আমরা নিত্য এবং অনিত্য নামক এমন দুটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি। কোনও বড়ো জিনিসকে কখনোই জোরপূর্বক পাওয়া যায় না, সেজন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাই। স্বস্তিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পরিবারের মতন। বিজয়াদশমীর পর খালি হাতে কখনও আসতেন না, মিষ্টি নিয়ে আসতেন। আর স্বস্তিকার কালীপুজোয় আসতেন সস্ত্রীক। অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তবে স্বস্তিকায় রাজ্য-রাজনীতি কলমে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আকর্ষণ করেছিল বহু পাঠককে। এই অভাব বহুদিন অনুভূত হবে। মৃত্যু স্থান কাল বিচার করে না। তার সময় হলেই হাজির হয়— কোনও বাধা মানে না। সেজন্য স্বস্তিকা হারাল রাজ্য-রাজনীতি কলমের নিশাকর সোমকে আর স্বস্তিকা পরিবার হারালো তার এক নিকট আত্মীয়কে। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় নিমতলা মহাশ্মশানে। সেখানে স্বস্তিকার পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যান স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য ও সহ-সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্য।

আমরা তাঁকে বরাবর আপনজন মনে করেছি। নিজের সম্বন্ধে অনেকেই অল্প বয়স থেকে কথা-সমুদ্র তৈরি করে ভাসতে ভালোবাসেন। নিশাকর সোম এক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত ঘরানার মানুষ। নিজের স্বাক্ষরিত লেখা নিজের হাতে দপ্তরে এসে দিতেন শীত গ্রীষ্ম বর্ষার দিনে। সে কাজ চলেছে বছরের পর বছর। একই শৃঙ্খলায়। সাময়িকপত্র আর খবরের কাগজের কাজের ধারার সঙ্গে ভালোরকম পরিচয় থাকায় সব কিছু নিষ্ঠায় সম্পন্ন করেছেন। নিয়মিত নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখার দরুন তাঁর পাঠকদের কাছেও তিনি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন সবসময়। জানতে আর বুঝতে চাইতেন পাঠক প্রতিক্রিয়া। আমরা তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি হাতে আসার পর যতটা সম্ভব যত্নে প্রকাশের কাজ করতাম। একসময় সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী থাকার দরুন জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ভালো-মন্দ মেশানো। বহু বিখ্যাত মানুষের পরিচয় পেয়েছেন বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নভাবে। তাঁর রাজনীতি বিশ্লেষণ ধারায় কখনও একমুখী আক্রমণ গুরুত্ব পায়নি। খবরের নানা সূত্র ধরে কোন সময়ে উজানে চলে গেছেন। পাদপ্রদীপের আলোয় আসা রাজনীতির লোকজনের ভাবভঙ্গি বচনধারা এমনভাবে বিশ্লেষণ করতেন যা শুধু আকর্ষণীয় রূপ নিত না, তার মধ্যে যথেষ্ট গভীরতা থাকত। গুরুতর অসুস্থ হওয়ার কদিন আগে লেখা দিতে এসেছিলেন পুরনো অভ্যেস। সৌজন্য মেশানো সেই মৃদুহাসি। যা এত বছরে একটুও পুরনো হয়নি। দেখে বোঝা যাচ্ছিল শরীরের উপর বেশ ধকল যাচ্ছে। একজন জানতে চাইলেন, 'কেমন আছেন?' একই রকম ভাবে একটু ম্লান হেসে বললেন, 'এবার জিগ্যেস করুন— কেন আছি?'

কিছু সংকট-সমস্যা তাঁকে ঘিরেছিল। তার মধ্যে শৃঙ্খলা আর নিষ্ঠায় সব কাজ করে চলেছিলেন মধ্য-সত্তর বয়সেও। একইরকম বিশ্লেষণী শক্তি আর কলমের জোর। কর্তব্য আর দায়িত্ববোধে সচেতন সাংবাদিক শেষ পর্যন্ত নিজের কলমের কালি শুকোতে দেননি। আমাদের আপনজন ছিলেন তিনি। তিনি আর লিখবেন না— এটা নির্মম সত্য। মৃত্যুর মতো নির্মম সত্যকে মানতে আমরা বাধ্য।

'স্বস্তিকা'র প্রস্তুতিকর্মের সঙ্গে যাঁরা জড়িত এবং যাঁরা পাঠক তাঁরা আপনজন নিশাকর সোমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আপন করে রাখবেন আগামীদিনের চলার পথে।

মা-মাটি-জলসা, ত্রিস্তর মন্ত্রিসভা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দিদিভাই,

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কথা আমরা জানতাম। এখন আপনি নতুন জিনিস শেখালেন। ত্রিস্তর মন্ত্রিসভা। ধন্যবাদ আপনাকে। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩ জন বিধায়ককে পরিষদীয় সচিব বানিয়েছেন আপনি। এঁরা সকলেই লালবাতি লাগানো গাড়ি পাবেন, মন্ত্রীর মতোই বেতন ভাতা পাবেন। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আছেই। এর আগে কেন্দ্রের ছয় মন্ত্রী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলে তাঁদের আপনি রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রকের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছেন। সেই বাবদ তাঁরা মহাকরণে ঘর, দফতর, গাড়ি, বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবিদার হয়েছেন। তাহলে সব মিলিয়ে ব্যবস্থাটা তো ত্রিস্তরই হলো নাকি!

হলো না? আমি আপনাকে আর একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। সবার উপরে মন্ত্রকের উপদেষ্টারা। তার নীচে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীরা। আর তার নীচে মন্ত্রী প্রতিম পরিষদীয় সচিবরা। এই ত্রিস্তর ব্যবস্থা সত্যিই রাজ্যের কাছে বড় পাওনা।

তবে মন্ত্রিসভায় যতই স্তর থাকুক, কাজ অবশ্য কারওর বিশেষ নাই। কারণ, সব কাজ যে আপনিই করছেন তা কে না জানে? এরই মধ্যে আপনার কবিতা লেখা, ছবি আঁকা (যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্নদের সঙ্গে সমানে সমানে) ইত্যাদি তো আছেই। নিন্দুকেরা আবার বলতে শুরু করেছে আপনি নাকি পার্টি ফান্ড গঠনের জন্য শীঘ্রই ড্রয়িং স্কুল খুলবেন। সেটা অবশ্য খুলতেই পারেন। কারণ, মাত্র ২০ মাসেই আপনি ৯০ শতাংশ (মতান্তরে ৯৯ শতাংশ) কাজ সেরে ফেলেছেন। সুতরাং বাকিটুকুতো আপনার কড়ে আঙুলের খেলা। খালি একটা বিষয় বুঝতে পারছি না। এত কিছুর পরও মানুষ আপনার খুঁত ধরে কী করে?

শুধু তো কাজ করাই নয়, রাজ্যবাসীকে আপনি মেলা উৎসব খেলায় যেভাবে ভরিয়ে রেখেছেন সেটাই বা কজন পারে? কজন পেরেছে? ভূ-ভারতে এমন উদাহরণ আর

কোথায় আছে বলতে পারেন! সুতরাং কোনও কথায় কান না দিয়ে মাটি উৎসবের পর বাকি থাকা মা উৎসব কিংবা মানুষ উৎসবও আপনি করতেই পারেন।

বাংলাকে প্রথম সারিতে নিতেই হবে আপনাকে। বেঙ্গল লিডসের স্লোগানই তো তাই। সুতরাং যাত্রা, নাচ, গান, এসব শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। আপনি তো জবাব দিয়ে বলেওছেন, ‘‘উৎসবের মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নয়ন ঘটে। ...আমরা উৎসব করব না তো কি শ্রাদ্ধ করব? ...শকুনের ভাগাড় তৈরি করব? ...যদি খুশি দিই, তবে ক্ষতি কী?’’

সত্যিই তো ক্ষতি কী? রাজ্যের কোষাগার শূন্য। অভাব চলছে সব খাতে। তাবলে কী উৎসব হবে না? আচ্ছা অভাবের সংসারেও যদি একটু হাসির উপাদান পাওয়া যায় তবে তো ভালোই লাগে নাকি। শুধু চোখের জল ফেললেই কী অভাব মিটে যায়?

শাস্ত্রে বলেছে, যত দিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে। ঋণ করেও ঘি খাবে। আপনি তো শাস্ত্র মেনেই চলছেন। সুতরাং আপনাকে সাধুবাদ দিতেই হবে। গত ২০ মাস ধরে আপনি বলে আসছেন রাজ্যের হাল খারাপ। কিন্তু তা বলে আপনি ঘোষণা বন্ধ রাখেননি। মাদ্রাসা, মৌলবিদের ভাতা দেওয়া থেকে হাজার হাজর প্রকল্প ঘোষণায় কোনও অভাব রাখেননি। একেই তো বলে সাহসিকতা। বলেছেন, কেন্দ্রকে সুদ দিতে পারছেন না। বাজার থেকে ১৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ধার করেছেন কিন্তু দান খয়রাতি করার ব্যাপারে সতর্কতার ধার ধারেননি। একেই তো বলে নির্ভীকতা। এ পর্যন্ত আপনি বিভিন্ন ক্লাবকে ৪০ কোটি টাকা দিয়েছেন। সুন্দরবন কাপ ফুটবলে খরচ করেছেন ১.১৮ কোটি টাকা। জঙ্গলমহল কাপে অনুদান দিয়েছেন সাড়ে ৪ কোটি টাকা। বিবেক উৎসবে খরচ করেছেন ১৫ কোটি টাকা। মাটি উৎসবে ১০ কোটি টাকা। কৃষি মেলায় ৩ কোটি টাকা।

দিদি আপনার অনেক গুণ। কিন্তু অভাবের সংসারে আপনি যেভাবে এমন আমোদ দিচ্ছেন তাতে আপনাকে মনে হয় ম্যাজিশিয়ন। টাকা নেই কিন্তু খরচেও বাধা নেই। আপনাকে বাহবা দিতেই হবে।

— **সুন্দর মৌলিক**

বিবেকানন্দ-ময়রার দোকান

অমলেশ মিশ্র

ছোটবেলা থেকে একটা কথা প্রায়ই শুনে আসছি, আমার মতো হয়তো অনেকেই শুনে আসছেন, যে ময়রারা মিষ্টি খায় না। এত বড় মিষ্টি দোকান— এত রকমের মিষ্টি জিবে জল আসে— খেতে গেলে পয়সা লাগে, কিন্তু যার দোকান সে মিষ্টি খায় না! আরে ভাঁড় থেকে বাদামগুঁড়ো মিশিয়ে বাদামী বরফি, রসগোল্লা, রাজভোগ, দানাদার, চমচম, লেডিকেনি ইত্যাদি— একই ছানায় মিশ্রণ ও অন্য আঙ্গিকের অল্পস্বল্প হেরফের করে কত বৈচিত্র্য। কত বিচিত্র মিষ্টি! সবই ময়রা বিক্রি করবেন, নিজে খাবেন না।

অথচ দেখুন ময়রার শরীর স্বাস্থ্য কেমন তেল চকচকে নাদুস নুদুস! কী করে হলো? তার তো পয়সা লাগবে না! এত বড় সুযোগ মিষ্টি খাওয়ার তবু সে মিষ্টি খাবে না!

আমরাও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মিষ্টি খেতে পারি না। তবে মিষ্টি কিনি না এমন নয়। কিন্তু অনেক টাকা দিয়ে মিষ্টি কিনে নিজে আর খাওয়া হয় না--- কোনও না কোনও আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, সাধভক্ষণ, অতিথি আপ্যায়ন কত কাজে মিষ্টি দরকার হয়। আর এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে কিনতেও হয়। ময়রারা বিক্রি করেই খালাস। কিনতেও হয় না, খেতেও হয় না। একই ছানা। তার থেকেই কত রকম মিষ্টি! দাবাদাবি করে কড়াইতে কম আঁচে দীর্ঘক্ষণ নাড়াড়াড়ি করে সন্দেশ। একটাই উদ্ভব— যে মিষ্টি নিজে না খেয়ে আমাদের মিষ্টি বিক্রি করার প্রক্রিয়াতে।

প্রসঙ্গত মনে এল স্বামী বিবেকানন্দের কথা। এখন চারিদিকে চলছে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালন। সরকারি উদ্যোগে, ক্লাবগুলির উদ্যোগে, সাংস্কৃতিক নানা কিসিমের সঙ্ঘের উদ্যোগে। কোথাও বিরাট সমারোহ। কোথাও স্বল্প সমারোহ। কিন্তু হচ্ছে। কতজন তাঁর কথা বলছেন।

আমার সবকিছু দেখে শুনে কেমন যেন মনে হচ্ছে— আমরা সবাই ময়রা আর বিবেকানন্দ হলেন দুধ থেকে সার নিষ্কাষিত ছানা। বিবেকানন্দকে আমরা কত রূপে জনগণের সামনে নিয়ে যাচ্ছি! আমরা ময়রার মতো বিবেকানন্দ বিক্রি করেই চলেছি একশত বছর ধরে— কিন্তু কেউ খাচ্ছি না, ময়রারা যেমন শুধু বিক্রি করে, নিজেরা কখনও খায় না। বিবেকানন্দের ছেলেবেলা (বিবেকানন্দ গুজিয়া), বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ (বিবেকানন্দ সন্দেশ), বিবেকানন্দের জ্ঞান (বিবেকানন্দ রসগোল্লা), বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা (বিবেকানন্দ রাজভোগ)। বিবেকানন্দের সমাজসেবা (বিবেকানন্দ বরফি) ইত্যাদি।

আমরা ময়রা। আমরা বেশ নাদুস-নুদুস। আমরা কতরূপে বিবেকানন্দ বিক্রি করছি। কিন্তু খাচ্ছি না। ব্যবসার খাতিরে ময়রার যেমন নির্লিপ্ত মিষ্টি বিক্রি, আমাদেরও বিবেকানন্দের উপর বক্তৃতা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব কত রকমের ময়রা গিরি। ব্লাড সুগার, হাইপ্রেসার ইত্যাদির ভয়ে আমরা কেউই বিবেকানন্দ খাই না— শুধু বিক্রি করি। ছোট ব্যবসাদার যেমন আছে তেমনি বিবেকানন্দের উপর করপোরেট হাউসও আছে। সকলেই একান্ত নির্লিপ্ততায় বিবেকানন্দ বিক্রি করছে— কেউ খাচ্ছে না— সকলেই নাদুস-নুদুস।

আমার মনে হয়— বিবেকানন্দ হলেন— ভারতীয় সনাতন দর্শনের ফলিত রূপ, মূর্ত-প্রতীক। তাঁর চিকাগো বক্তৃতার সারাংশ হলো— গর্বভরে বল আমি হিন্দু। হিন্দু শব্দটি তাঁর কাছে সাগর ছেঁচা মানিক। বিবেকানন্দ তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় প্রথমদিনই (১১.৯.১৮৯৩) বললেন যে তিনি কোটি কোটি হিন্দু জনতার প্রতিনিধি হিসাবে, হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে, হিন্দু জাতির প্রতিনিধি হিসাবে— ওই ধর্মসভায় উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ পুরোটাই হিন্দু এবং হিন্দুত্ব।

যে হিন্দুজাতি নিয়ে বিবেকানন্দের এত গর্ব, যে হিন্দু দর্শনকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ দর্শন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই হিন্দুজাতি এখন একটি সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক

“যে হিন্দুজাতি নিয়ে বিবেকানন্দের এত গর্ব, যে হিন্দু দর্শনকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ দর্শন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই হিন্দুজাতি এখন একটি সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতে ঠিক যেমন খৃস্টান সম্প্রদায়, ইসলাম সম্প্রদায়, ইহুদি সম্প্রদায়।”

জগতে ঠিক যেমন খৃস্টান সম্প্রদায়, ইসলাম সম্প্রদায়, ইহুদি সম্প্রদায় ইত্যাদি।

এই অবনমনের কোনও প্রতিবাদ আমরা করেছি? করিনি। করিনি কারণ আমরা ময়রা। আমরা মিষ্টি বিক্রি করি, মিষ্টি খাই না।

হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয় হিন্দুধর্মস্থান আক্রান্ত হয়। আমরা আমাদের বিবেকানন্দ ক্লাব, বিবেকানন্দ সংগঠন, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠান, বিবেকানন্দময় ব্যক্তি— কেউ কি কোনও প্রতিবাদ করেছি? পাশে দাঁড়িয়েছি হিন্দু মানুষের? না প্রতিবাদ করিনি। পাশে দাঁড়াইনি। কারণ আমরা ময়রা। মিষ্টি বিক্রি করি, মিষ্টি খাই না। বড় কথা— আমরা অসাম্প্রদায়িক, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ।

আমি বিবেকানন্দ বক্তা--- আমার সামনেই এক নারী লাঞ্ছিতা হলেন। আমি কি সেই নারীকে রক্ষার চেষ্টা করেছি? না করিনি। কারণ আমি ময়রা। মিষ্টি বিক্রি করি, খাই না। কত নারী লাঞ্ছিতা হচ্ছেন, আমি তার কী করব?

সমাজে এখন নানারকম বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচারের ঘটনা ঘটছে। আমার বিবেকানন্দ ক্লাব, বিবেকানন্দ সংগঠন, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠান, বিবেকানন্দের করপোরেট হাউস কেউ কি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই ব্যবস্থার সংস্কারে নেমেছি? না নামিনি। কারণ আমি ময়রা। মিষ্টি বিক্রি করি, মিষ্টি খাই না। আমরা, রাজনীতি করি না।

এছাড়াও আমার আরও একটা যুক্তি আছে এই উদাসীনতার, এই নির্লিপ্তির। তাহলো— আমি রাজনীতি করি না।

কত গর্দভ আমি! বিবেকানন্দ কি কোনও রাজনীতির দল করতেন নাকি? এদেশের কোনও মনীষী কি কোনও দলের নেতা, মন্ত্রী ছিলেন নাকি? রাজনীতি না করেও যদি তিনি জনসেবা, দেশসেবা এবং তার অঙ্গ হিসাবে অনাচার, ব্যভিচারের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে পারেন, আমার বিবেকানন্দ ক্লাব, বিবেকানন্দ সংঘ, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠান, বিবেকানন্দ কর্পোরেট হাউস পারে না কেন? পারে না কারণ আমি ময়রা, আমি মিষ্টি বিক্রি করি— সেটাই আমার ব্যবসা। আমি মিষ্টি খাই না। মিষ্টি আমি খেয়ে নিলে— আমার দোকান, আমার কর্পোরেট হাউস, আমার বক্তৃতা, আমার সংঘ, আমার প্রতিষ্ঠান, আমার ক্লাব বন্ধ হয়ে যাবে। আমি না খেতে পেয়ে মরব। আমার এই নাদুস-নুদুস চেহারা থাকবে না।

তাহলে তুমি কী করবে? বিবেকানন্দের প্রিয় ভারতবর্ষ, প্রিয়তম হিন্দু জাতি, হিন্দুদর্শন নিয়ে তোমার যদি সক্রিয় কোনও ভূমিকা না থাকে, তবে তোমার অস্তিত্বের যুক্তি (রিজন্-ডি-আত্র্) কি? প্রয়োজন কোথায়?

আমি বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা নিয়ে অবহিত, অনেক পড়েছি। যদি কোথাও আমাকে বা আমার বিবেকানন্দ নামের সংগঠনের পক্ষ থেকে কোথাও আমন্ত্রণ জানায় বক্তৃতা দিতে, তাহলে আমি এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা নিয়ে ভাষণ দিতে পারি। কিন্তু এতই যদি ভাল মনে কর বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা, তাহলে এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই চিন্তা ঢোকাও না কেন? যখন বিবেকানন্দ বিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশ থেকে আমদানি করে তোমার দেশের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে— যার অব্যবস্থিত কুফল প্রত্যহ তোমার সামনে তুমি দেখতে পাচ্ছ— তখন তুমি চুপ থাক কেন? প্রতিবাদ কর না কেন? দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা প্রয়োগ কর না কেন? তোমার তো বিবেকানন্দ সঙ্ঘ আছে। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠান আছে, বিবেকানন্দ কর্পোরেট হাউস আছে— তবু বিবেকানন্দের কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরোয় না কেন? কেন তা এদেশের কাজে লাগাও না?

এত প্রশ্নের একটাই উদ্ভব— আমি, আমার বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, আমার বিবেকানন্দ সংগঠন, আমার বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠান, আমার বিবেকানন্দ কর্পোরেট হাউস— সবই ময়রা— মিষ্টি বিক্রি করে, মিষ্টি খায় না।

বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ উদযাপন কত সংগঠন, কত মানুষ যে করেছেন তা ভাবা যায় না। আমি চরম বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে— এই চরম ভোগ সর্বস্বতার যুগেও এতজন বিবেকানন্দ ভক্ত আছেন! এই বিস্ময়ের পরই প্রশ্ন জাগল— এত সংঘ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট হাউস, মাল্টিনাশন্যাল কোম্পানি চলছে বিবেকানন্দের নামে— এরা যদি নিজেদের বিশ্বাসকে একত্রিত করে একবার কথা বলে, কোনও রাজনীতির দল না করেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। এতজন মানুষ, এত প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকে যদি এক মগ করে জল ঢালেন— সব রাজনীতিক ও তাদের দলগুলি ডুবে যাবে। নাকানি-চোবানি খেয়ে বাধ্য হয়ে বিবেকানন্দের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু করতে।

আর কে না জানে যে ভাল শিক্ষা ব্যবস্থাই একটা ভাল দেশ কড়তে পারে।

কিন্তু তা হবে না। কারণ আমরা সকলে ময়রা। মিষ্টি বিক্রি করি, মিষ্টি খাই না। বিবেকানন্দের কথা বলি, বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করি না।

বিবেকানন্দ যতদিন বেঁচে ছিলেন, যা করেছিলেন, যা বলেছিলেন, যা লিখেছিলেন— তার মধ্যে অতি সমান্য অংশেই তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের কথা আছে। গুরু ছিলেন অন্তরে, বাইরে ছিল গুরু নির্দেশিত পথে কাজ। আমাদের তো গুরুপূজা করতেই সময় চলে যাচ্ছে। আমাদের গুরু—বিবেকানন্দ আমাদের অন্তরে নেই— কেবল বাইরেই আছে। আমরা ময়রা মিষ্টির পসরা সাজিয়ে বসেছি— সবই বাইরে সাজানো— কত ঢং-এ, কত রং-এ, কত স্বাদে ভিতরে আছে শুধু ক্যাশ বাক্সে— যার উপর নির্ভর করছে আমার চকচকে, নাদুস-নুদুস হওয়া।

তাই এত বিবেকানন্দ প্রেমী, বিবেকানন্দ স্ট্যাচু, বিবেকানন্দ সংগঠন, বিবেকানন্দ সংঘ, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠান এমন কি বিবেকানন্দ কর্পোরেট হাউস থাকা সত্ত্বেও এদেশের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়। কোনও দেশের চিটফান্ড কি সেদেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? পারে না। তাই আমরাও আমাদের বাড়ি, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাল করতে পারছি না। আমরা সব বিবেকানন্দ চিটফান্ড চালাচ্ছি— কোথাও সমবায়ে, কোথাও ব্যক্তি-মালিকানায়, কেউ নিয়মিত কর্মী, কেউ কমিশন এজেন্ট, কেউবা স্রেফ সেলস্ম্যান।

পাকিস্তানের নজিরবিহীন বর্বরতা ও ভারত

নীতিন রায়

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় ভারত-পাক সীমান্তে মেনধর। জম্মু থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে মেনধর একটা সেনা পোস্ট। রাজপুতনা রাইফেলের ১৩ নম্বর ব্যাটিলিয়ানের দু'জন অসম সাহসী সেনা এই সীমান্তের পাহারায় নিয়োজিত। এদের একজন হেমরাজ, অন্য জন সুধাকর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন ও অন্ধকার। ভোর হতে তখনও অনেক সময় বাকি।

শহীদ পরিবারের সঙ্গে সেনাপ্রধান।

সেখানে পাহারা দেওয়া মানে হেটে যাওয়া। অনুপ্রবেশ যাতে ঘটতে না পারে তর জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা রয়েছে। ৭৭০ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে বেড়া। ভারতীয় জমিতেই এই বেড়া। এই বেড়া দেওয়ার সময় পাকিস্তান বাধা দিয়েছে নানা ভাবে। কখনও কূটনৈতিক স্তরে, কখনও বা গুলিগোলা চালিয়ে। বেড়ার ভিতরে এল ও সি থেকে দূরে ভারতের স্থায়ী পোস্ট বা ছাওনি রয়েছে। কোথাও দুটি, কোথাও বা তিনটি সারিতে তারের পাইপ ফেলা আছে। তাকে ঘিরে ১২ ফুট উঁচু এবং ৪ ফুট প্রশস্ত তারের দেওয়াল তোলা হয়েছে। এই পাইপের ভেতরে কোথা দিয়ে যাওয়া আসা করা যাবে তার জন্য ভারতীয় সেনাদের কাছে রয়েছে থারমাল ইমেজ। এই থারমাল ইমেজ বলে দেয় কোথায় রয়েছে বিদ্যুৎ, কোথায় আছে ধাতব ধারালো বস্তু আর কোথায় কাঁচের টুকরো। তাই ভারতীয় সেনাদের কাছে এই তারের পাইপের মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়া সহজ।

পাকিস্তানের সীমানায় রয়েছে তাদের পোঁতা ল্যান্ডমাইন। তাই সহজ নয় বেড়া ডিঙানো। প্রতি এক কিলোমিটারে ৫ থেকে ৭টি সেনা পোস্ট রয়েছে। প্রত্যেক পোস্টে ৫ জন করে সেনা থাকে। যখন পাহারা চলতে থাকে তখন কথা বলা বন্ধ। সিগারেট খাওয়া বারণ, মোবাইল ও ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালানো নিষেধ। সেভিং ক্রিম ব্যবহারও নিষেধ। কেননা জঙ্গিদের কুকুররা তা টের পেয়ে যাবে।

সুধাকর ও হেমরাজ বেড়ার ভেতরেই ছিলেন। এবং তা লাইন অফ কন্ট্রোল (এল ও সি) থেকে বেশ কিছুটা দূরেই। দীর্ঘদিন চলে আসা রীতি অনুযায়ী মোট চারটি জোড়ায় অর্থাৎ ৮ জন সেনা পাহারা দিচ্ছিলেন। ব্যবস্থাটা এই রকম যে প্রত্যেক জোড়া অপর প্রান্তের জোড়াকে দেখতে পাবে। কিন্তু যখন কুয়াশায় ঢাকা থাকে তখন বোঝা মুশকিল কে কোথায় আছে। যে জোড়া হেমরাজ ও সুধাকরের উপর নজর রাখছিল তারা দেখতে পায়নি কারা গুলি চালাচ্ছিল। দ্বিতীয় জোড়াটি যখন দৌড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তখন তাদের উপরও বুলেট বৃষ্টি হলো। তারা বুঝতে পারলো সীমান্তের ওপার থেকে কভারিং ফায়ার আসছে। পাকিস্তানিরা পাহাড়ের উঁচু থেকে ফায়ার করছিল। তারা আরও বুঝতে পারলো এটা জঙ্গিদের কাজ নয়। কারণ ওরা ওই দুজনকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। জঙ্গিরা হলে যাদের দেখতে পেতো, তাদের সবাইকে হত্যা করত।

শত্রুপক্ষ শুধু দু'জনকে হত্যা করতে চেয়েছে। শুধুমাত্র দু'জন। এবং তাদের দেহ সিজ করতে অর্থাৎ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ভারতীয় পোস্ট থেকে প্রত্যুত্তর দেওয়া হলো। দিনের আলোতেও গোলাগুলি বিনিময় হলো। কুয়াশা কেটে গেলে দেখা গেলো পাকিস্তানের স্পেশাল ফোর্সের উপস্থিতি। কালো পোষাক পরিহিত যারা (ব্লাক স্টোর্ক) নামে পরিচিত। বালুচ রেজিমেন্টের ২৯নং ব্যাটেলিয়ন কভারিং ফায়ার করছিল। সকাল ১১-৩২ মিনিটে ফায়ারিং বন্ধ হলো। হেমরাজ ও সুধাকরের দেহ মাটিতে পড়ে আছে। একে অপরের কাছ থেকে দূরে। রক্ত তখন জমাট বেঁধে গেছে। সুধাকরের মাথাটা পাওয়া যায়নি। হেমরাজের গলাও ছুরি দিয়ে কাটা। কিন্তু তার মাথাটা নিয়ে যেতে পারেনি। হয়তো পুরস্কার মিলবে সেই আশায় শত্রুরা কাটা মাথাটা নিয়ে গেছে। পাকিস্তানের এস এস জি নামক স্পেশাল ফোর্স 'কুখ্যাত হয়ে আছে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে অমানবীয় ব্যবহার করার জন্য। এরা ধৃত এবং মৃত সেনাদের দেহ নিয়ে খেলা করে। তাকে অসম্মান করে। পাকিস্তানের সাধারণ সেনাবাহিনী যুদ্ধের নিয়ম মেনে চলে। কিছুদিন আগে একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার পাকিস্তানি সীমানায় চলে যায়। পাকিস্তানের সাধারণ সেনাবাহিনী

তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু ব্ল্যাক স্টোর্ক আই এস আই নিয়ন্ত্রিত। এস এস জি-র নানা ট্রিক্স এখন সবার জানা। সৌরভ কালিসার মৃত্যু আমাদের মনে করে দেয় আই এস আই-এর নৃশংসতা। পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি চুক্তির কথা হলেই ভারত আক্রান্ত হয়। ভারত সরকারে যারা থাকেন তার প্রায়ই শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তার পিছনে থাকে ভারতে মুসলিম তোষণের রাজনীতি। ভারতবর্ষের যেন একটাই কাজ— পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি বৈঠক করা। অনেকের সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও তারা তা উপেক্ষা করে। তাদের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে অপদস্থ করা। পাকিস্তানে চার ধরনের এলিমেন্ট কাজ করছে, যথা—

(১) নির্বাচিত সরকার,

(২) সেনা ও আই এস আই,

(৩) জঙ্গিবাহিনী,

(৪) জনগণ।

চুক্তি হয় সরকারে সরকারে। ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে চুক্তি হলেও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও আই এস আই-এর অনুমোদন প্রয়োজন। আই এস আই এবং সেনা নিয়ন্ত্রণ করে জঙ্গিদের। জঙ্গিরা চায় না ভারতের সঙ্গে চুক্তি হোক। তাহলে জেহাদের গরম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। জঙ্গিদের গরম রাখতে সেনা ও আই এস আই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইবে না।

ভারতের সমস্যা হচ্ছে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক বা তোষণ রাজনীতি। তোষণের রাজনীতি এমন পর্যায়ে গেছে দেশের স্বার্থের চেয়ে তা বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু সাংবাদিক ভারতের দুই জওয়ানের মৃত্যুর চেয়ে পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করায় গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। তারা মুখরোচক কথা বলে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচিত সরকারকে সেনার উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। মনে রাখতে হবে আমেরিকায় ধৃত পাকিস্তানি গুপ্তচর ফাই-এর দেওয়া তথ্য হতে জানা যায় বহু বিখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী আই এস আই-এর টাকায় দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতেন। তারাই কৌশলে নানা কথা বলছেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কে জি বি অর্থের বিনিময়ে ৪০০০ হাজার প্রবন্ধ ভারতের পত্রপত্রিকায় ছাপিয়ে ছিল যা ভারতীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা লিখেছিল। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এই সমস্ত সাংবাদিকদের ভূমিকা তাই খতিয়ে দেখা দরকার।

পাকিস্তান সহ্যের সীমা (জিরো টলারেন্স) অতিক্রম করে গেছে। চাই নুতন করে ভাবনা। ওবামা যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি চাননি। কারণ ডেমোক্র্যাটরা শান্তি, আলোচনা ইত্যাদি শব্দগুলো পছন্দ ও ব্যবহার করতে আগ্রহী। ওবামা পাকিস্তান সরকার ও সেনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তার নীতির পরিবর্তন করেছেন। যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ড্রোন আক্রমণ। জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে এ এক সফল প্রয়াস। এর জন্য পালানিটির নামে এক কোম্পানীর এক যুবক ইঞ্জিনিয়ার একটি সফটওয়ার ডেভলপ করে। আর তার সাহায্যে ড্রোন আক্রমণ সফল হচ্ছে। ওবামা তার ভাবনা বদল করেন গোয়েন্দা দফতরের রিপোর্টের ভিত্তিতে। আর আমরা সফটওয়ার তৈরিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের গোয়েন্দা তথ্যগুলি সার্বিকভাবে বিশ্লেষিত হচ্ছে না। যার ফলে বিপদ বাড়ছে। দু'জন সৈনিকের মৃত্যুর পরও ভারত সরকার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল। তখনও সলমন খুরশিদ শান্তি বৈঠক থেকে সরে আসেননি। রাজপুতানা রাইফেলস অনশন শুরু করে যা সেনা বিদ্রোহের সমান। যখন ভারতে সেনা প্রধান বক্তব্য রাখেন তখন সরকার নড়েচড়ে বসে। জনগণের ও সেনাবাহিনীর চাপে ইউপিএ সরকার বাধ্য হয় শান্তি বৈঠক থেকে সরে আসতে।

কিছুদিন পর শুরু হয়ে যাবে খেলার সঙ্গে রাজনীতিকে মেশানোর স্লোগান। ম্যান টু ম্যান সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদি নানা তত্ত্বকথা। সবই পুরোনো ও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তাই নতুন ভাবনায় তৈরি হতে হবে। ভাবনাগুলো নিম্নরূপ হতে পারে—

(১) জাতিসঙ্ঘে বিষয়টি বার বার তোলা।

(২) কূটনৈতিক স্তরে সারা বিশ্ব জুড়ে প্রচার।

(৩) ভারতে বিনিয়োগকারী দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা পাকিস্তানের উপর চাপ দেয়।

(৪) নির্বাচিত বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সামরিক অভিযান।

মনে রাখতে হবে পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। ভারতের গণতন্ত্রের সুযোগে একদল ভারতীয় সাংবাদিক পাকিস্তানের হয়ে কৌশলে ব্যাটিং করছেন। একজন সক্ষম দেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী নেতাই পারেন ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের মতলবি ক্ষমতাকে দুমড়ে মোচড়ে ভারতের স্বার্থকে সুনিশ্চিত রাখতে।

ল্যান্স নায়েক হেমরাজ ও ল্যান্স নায়েক সুধাকর সিং।

পর্দার আড়ালে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রক

আমেরিকা, আল্লাহ আর আর্মি

২০১১-র জানুয়ারি, ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

রথীন রায়

মানুষটি পাকিস্তানে ঝড় তুলেছেন। হাজার হাজার লোক একত্রিত হয়েছে শুধুমাত্র এক নজর তাঁকে দেখার জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই মহিলা, এমনকি ছোট ছোট মেয়েরাও। তারা ধৈর্য ধরে নীরবে তার কথা শুনছিল। মানুষটির দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে। তা সত্ত্বেও পার্লামেন্টারি নির্বাচনের কয়েক মাস আগে নির্বাচিত সরকারকে গদিচ্যুত করতে চান তিনি। তার চেয়ে আশ্চর্য, সাধারণ মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেছে। তাঁর পরনে ইসলামিক পোষাক, গলায় গলাবন্ধ। লম্বা পোষাকের মানুষটি সবাইকে অবাক করে দিয়ে আধুনিকতার কথা বলছেন। যখন মনে হচ্ছিল পাকিস্তান নামে দেশটা জঙ্গিদের হাতে চলে গেছে। ইসলামাবাদের বুকে বসে আধুনিকতার কথা বলছেন ভদ্রলোক। আবার কিনা বোরখা ছাড়তেও বলছেন! মেয়েদের আধুনিক হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। নির্বাচনের আধুনিকীকরণ চাইছেন। প্রচলিত নির্বাচনকে বলেছেন, 'নির্বাচিত একনায়কতন্ত্রের' নির্বাচন। তিনি একথা বলতে ভোলেননি যে পাকিস্তানের নিজের অসুখ নিজেই তৈরি করেছে। বাইরে থেকে কেউ এসে রোগ ছড়ায়নি। ভারতকে গালি দেননি একবারও। গীতার শ্লোকও আওড়েছেন। এটা ভাবতেও অবাক লাগে পাকিস্তানের কোনও স্থানে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছে আর ভারতকে গাল দেয়নি।

মানুষটির নাম তাহির-উল-কাদরি। কানাডার নাগরিক আবার পাকিস্তানেরও নাগরিক। দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে তার। তার বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হলো 'দুটো মাত্র সংস্থা রয়েছে পাকিস্তানে, যারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে— একটি সেনাবাহিনী ও অন্যটি বিচার বিভাগ', তখন পট পরিবর্তন হলো। যা তিনি অর্জন করলেন তাই তিনি হারিয়ে ফেললেন। মানুষ বলতে লাগলো, তিনি সেনার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। এটি একটি সেনা অভ্যুত্থান। ২০০৭ সালে জানুয়ারিতে বাংলাদেশে এমন একটি সেনা অভ্যুত্থান হয়, যার দ্বারা বাংলাদেশী সেনা দু'বছর রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই অভ্যুত্থানকে স্পষ্ট 'ক্যু' বলা যেতে পারে।

বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবলে কাদরিকে বোঝা যাবে না। কেননা জারদারি সরকারের সাফল্য খুব কম। সাড়ে চার বছর ধরে সরকার চলেছে। নানা সমস্যায় জর্জরিত। একমাত্র সাফল্য— নির্বাচিত সরকার হিসেবে টিকে থাকা। পাকিস্তানের ইতিহাসে জারদারি সরকারের ৫ বৎসর টিকে থাকা এক অনন্য নজির। কেননা জারদারি সরকার ৫ বৎসর টিকে থাকুক অনেকেই চাননি।

এটা মনে রাখতে হবে যে সুপ্রিম কোর্ট পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। সেইসঙ্গে বর্তমান সরকারকে গদিচ্যুত করতে কাদরির ডাকে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছে। অন্যদিকে আবার পাকিস্তান সেনাবাহিনী দু'জন কর্তব্যরত ভারতীয় সেনার মাথা কেটে নিয়ে গেছে। তিনটি ঘটনাই আলাদা আলাদা ঘটেছে। তাই বিচ্ছিন্ন মনে হতে পারে। কিন্তু সবই যেন একসূত্রে গাঁথা— সব ঘটনারই নেপথ্যে সেনার কালো হাত রয়েছে। কাদরির সেনার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো এই ধারণা বদ্ধমূল করতে বাধ্য করেছে।

পাকিস্তান বার বার অস্বীকার করছে, তা সত্ত্বেও পাকসেনার ছায়া রয়েছে। পাকসেনা সরাসরি দেশ শাসন করতে চায়। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট যোজনায় যোজনাবদ্ধ করলে তা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করবে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেনা দেখাতে চায় সর্বত্র দুর্নীতি, সেনা ও বিচার বিভাগের মধ্যে কোনও যোগাযোগের

চিহ্ন নেই। কিন্তু জারদারি সরকারের সঙ্গে সেনা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। কাদরি সেনার প্রতি অনুগত। ১৯৯৯ সালে পারভেজ মোশারফের অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছিলেন কাদরি সাহেব।

নানা দোষ সত্ত্বেও গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য জারদারি সরকারকে প্রশংসা করতে হয়। টেলবট নামে জনৈক লেখক একটি বই লেখেন। এ বইতে টেলবট বলেছেন, ''এ কথা বললে ভুল হবে যে জারদারি সরকারের যুগ শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করবার যুগ। নওয়াজ শরিফ ও জারদারির পার্টি উভয়েই কিছু রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করেছে। সরকারি স্বীকৃত বিরোধী দল সরকারের চেয়ে সেনার সমালোচনায় মুখর ছিল এবং সেনার সঙ্গে যুক্ত

পাকিস্তানে মৌলবাদীদের উল্লাস।

হয়ে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেনি।'' টেলবট একথাও বলেছেন জারদারি শুধুমাত্র কথার কথা দেননি, কাজেও কিছু করেছেন। তিনি রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় এগিয়ে গেছেন। অনেক দিনের জমা থাকা রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করেছেন।

নওয়াজ শরীফের পি এম এল (এন) ও ইমরান খানের তেহরিফ-ই-ইনসাফর পার্টি পাকিস্তানের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছে। পি এম এল (এন) ও পিপিপি অন্তবর্তীকালীন নির্বাচন নিয়ে বোঝাপড়া করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলির ভিতর পারস্পরিক আস্থা যত বাড়ছে পাকসেনা নেতারা ততটাই

পাকিস্তানী সেনা।

বিচলিত হয়ে পড়ছেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভক্ত করার জন্য সেনা কর্তৃপক্ষ কাদরি সাহেবকে মাঠে নামিয়েছে। তাই কাদরি দাবি তুললেন নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে নির্বাচন এগিয়ে আনার জন্য। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো তা সমর্থন করেনি। তার ফলে কাদরি সাহেবের নির্বাচন শুদ্ধিকরণ করার দাবি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। কোনও রাজনৈতিক দলই সামরিক বাহিনীর চক্রান্তকারীদের (জুন্টা) সঙ্গে মিলে সরকার উৎখাত করতে চায়নি।

সেনাকে বাধা দেওয়ার মতো কোনও শক্তি পাকিস্তানে নেই। পাকিস্তানে সেনা এক শক্তিশালী সংগঠন। কিন্তু একথাও বলতে হবে যে পাকিস্তানের সেনা ক্ষমতা দখল করবার শক্তি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। পাকিস্তানের এক ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তানে ক্ষমতা দখলই করতে একটি জিপ ও দুটি লরিই যথেষ্ট। একথা বলতে দ্বিধা নেই পাকিস্তানে এখন সেনাবাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করতে চায় না। কোনও রাজনৈতিক দলই সেনার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে রাজি নয়। আবার সামরিক জুন্টার পায়ের নীচে বসে ক্ষমতার আস্বাদ নিতেও আগ্রহী নয়। সামরিক শক্তির 'কাদরি ফরমূলা' কোনও কাজে লাগেনি। আমেরিকা পাকিস্তানের মাটিতে রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তনে আগ্রহী নয়।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন কোনও সমাধান নয় বরং সমস্যার কারণ। হোসাইন হাক্কানি আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'পাকিস্তান : বিটিউন দ্যা মস্ক অ্যান্ড আর্মি', বইটিতে আছে পাকিস্তানের সামরিক জুন্টা সেই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয় যেগুলো আমেরিকার আন্তর্জাতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও অস্তিত্ব রক্ষার কারণে পাকিস্তানের অস্ত্র চাই। তাই অস্ত্রের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পাকিস্তানের সামরিক জুন্টা আমেরিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের নীতি বানায়।

পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি ইসলাম। এই নীতির উপর ভিত্তি করে আমেরিকা ও পাকিস্তানের সম্পর্ক গড়ে

উঠেছে। তার আরও একটি দিক হচ্ছে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি ভারত বিরোধী। তাই এই ভারত বিরোধিতা চাগিয়ে রাখতে চাই প্রচুর অর্থ। আর এই অর্থ জুগিয়ে থাকে আমেরিকা।

কাদরি সাহেব সেই বক্তৃতায় পাকিস্তানকে 'normal state'-এ ফিরে আসতে বার্তা দিয়েছেন। ওই বার্তা সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। একথা মনে রাখতে হবে যে আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় (২০০৪-০৭) আই এস আই-এর ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন জেনারেল পারভেজ আসফাক কিয়ানি। তালিবানরা আই এস আই-এর সমর্থন পেয়েছিল। লস্কর-ই-তইবার মুম্বাই আক্রমণের বিষটি আই এস আই খুব কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। সেনাপ্রধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সায়াতভেলী ও ফাটায় সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চালুর নির্দেশ দিয়েছিলেন কিয়ানি।

তবে সম্পূর্ণভাবে সেনাকে দায়ী করা ঠিক হবে না, সেনা বাইরে থেকেও সমর্থন পেয়েছিল। জুলফিকার আলি ভুট্টো যিনি বামপন্থী হয়েও কার্দিয়ানীদের ১৯৭৭ সালে অমুসলিম ঘোষণা করেন। এই সময় পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে। তারপর বেনজির ভুট্টো তালিবানদের আবিষ্কার করেন। বেনজির ভুট্টোর দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার সময় তালিবানরা কাবুলের ক্ষমতা দখল করে। ১৯৯৬ সালে তারা এ কাজ করে। এই সময় পাকিস্তান সরকার কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়। নওয়াজ শরীফের সময় ঈশ্বর বিরোধীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের সাজাযুক্ত আইন প্রণীত হয়। এই বিলটি বিখ্যাত 'শরীয়া আইন' নামে পরিচিত।

সমস্যা যতই ধরাছোঁয়ার বাইরে হোক তা নিয়ে জন আর স্মিথ একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'দ্যা আনরেভেলিং : পাকিস্তান ইন দ্যা ক্রেজ অফ জিহাদ'। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। পাকিস্তানকে যাঁরা প্রথমে শাসন করেছিলেন তাঁরা বর্তমান ভারত থেকে আসা শহরের মানুষ। তৎকালীন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সদস্যরাই পাকিস্তান শাসন করেছেন। তাঁরা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে চাননি। কারণ তাঁরা ছিলেন বহিরাগত। এই কারণে পাকিস্তান তার জন্ম থেকেই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে।

এই সমস্যা আরও বড় হয়ে দেখা দেয় যখন জিয়াউল হক ১৯৮০ সালে র‍্যাডিক্যাল ইসলামের মদত দেন। তিনি মনে করতেন পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ধর্মের হাওয়া দিয়ে। প্রথমে তিনি তা আফগানিস্তানে এবং পরে জম্মু কাশ্মীরে প্রয়োগ করেন। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরাই (র‍্যাডিক্যালরাই) তার কারিগরকে গ্রাস করলো। আর সমস্ত সমাজ মৌলবাদীদের আওতায় চলে গেল। পাঁচ বৎসরের পাকিস্তানি শিশুও পড়ছে— 'এ' দিয়ে আল্লাহ, 'বি' দিয়ে বন্দুক (তাতে বি 'ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার' ভাঙার ছবি)।

এখন পাকিস্তান গণতন্ত্রের ভিত শক্ত হচ্ছে। কিন্তু মুক্ত চিন্তা ও আধুনিকতার অভ্যুত্থান ঘটেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাদরির বক্তব্য ছিল বিপ্লবী। কিন্তু তাতে সেনার খুশি হওয়ার কথা নয়। তাই পাকিস্তানি সমাজ মৌলবাদীদের হাতে রয়ে গেল। এটা পাকিস্তানের সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যা অন্য দেশেরও মাথা ব্যথারও কারণ হয়ে উঠবে।

যতই বয়োবৃদ্ধ হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐ-গুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির একটিরও বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

(বাণী ও রচনা, ৫/২৯)

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সংখ্যালঘু দলগুলির জোট

আমরা এতদিন দেখেছি অধিকাংশ বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি যথা কংগ্রেস/ সিপিএম/তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের জন্য ব্যাপকহারে মুসলিম তোষণ করেছে। এর মধ্যে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সবার থেকে এগিয়ে গেছে ইমামভাতা, অজস্র নতুন মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়ে। এতদিন রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপি ছাড়া সব রাজনৈতিক দলগুলি নীরবে বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষী মুসলিমদের ব্যাপকহারে পূর্ব ও উত্তর পূর্বভারতে অনুপ্রবেশে মদত দিয়েছে, আজ যার ফলে অসমে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু, নিকট ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার কপালেও তাই আছে। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের সংঘাতের বীজ। ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ আনন্দবাজারের খবরে প্রকাশ, তিনটি সংখ্যালঘু প্রধান দল, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন Unit Democratic Front (UDF)'র সঙ্গে জোট বাঁধছে Social Democratic Party of India ও Welfare Party of India, মূলত রেজিনগর, নলহাটি ও ইংলিশবাজারের বিধানসভা উপনির্বাচন কেন্দ্র করে। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক হওয়ার বিভিন্ন ফায়দা স্বাধীনতার পর থেকেই মুসলিমরা চেয়ে এসেছে ও বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলির বদান্যতায় তা পেয়ে এসেছে যা তারা এখন নিজেদের হক বলে মনে করছে ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন চাইছে, এ এক ভয়ঙ্কর প্রয়াস। মুসলিমদের এই স্বপ্ন দেখার শুরু গত জঙ্গিপুর লোকসভার উপনির্বাচনে, যখন এই দলগুলির আলাদা দাঁড়িয়ে এই কেন্দ্রে প্রায় ১৭০০০ ভোট পায় যা শতকরা হিসাবে ১১.৭১ শতাংশ! এর মধ্যে উল্লেখ্য ১৯২৮ সালে মুসলিমদের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষার্থে আইনসভায় ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দাবি করেন মহম্মদ আলি জিন্না যা পরে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভর করে Lahore Conferance (1940) এ পাকিস্তান প্রস্তাবের আকার পায়। জিন্না তাঁর প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মধ্যে অবিভক্ত বাংলা চেয়েছিলেন যা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী নেতার জন্য বিফল হয়ে যায়। কিন্তু আজ কংগ্রেস সিপিএম ও সর্বোপরি তৃণমূল কংগ্রেসের (যার নেত্রী নিয়মিত প্রকাশ্যে নমাজ পড়েন) বদান্যতায় এবার বোধহয় জিন্নাসাহেবের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী যখন বলেন "সংখ্যালঘুদের দাবি দাওয়া নিয়ে যারা লড়াই করি তারা এক জায়গায় এসে একটা বার্তা দিতে চাইছি" (২৬ জানুয়ারি, আনন্দবাজার) তখন আবার সেই দ্বিজাতি তত্ত্বের সিঁদুরে মেঘ দেখা দেয়। নিকট ভবিষ্যতে সংখ্যালঘুরা হয়তো সংখ্যাগুরু হয়ে আবার দেশভাগের জন্যে নরমেধ যজ্ঞ শুরু করবে। পশ্চিমবাংলার ডি জি নপরাজিত মুখার্জির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে (১৯.১০.১২ আনন্দবাজার) প্রেরিত এক রিপোর্টে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার জন্য সিমির মতো নিষিদ্ধ সংগঠন মাওবাদীদের সঙ্গে আঁতাত গড়ছে মুসলিম প্রধান সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে আই এস আই-এর মদতে।

তাই আসুন আমরা এই ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে সচেতন করে তুলি, যাতে আবার নিজভূমে পরবাসী না হতে হয়।

—তথাগত ভট্টাচার্য, খড়দা উত্তর ২৪ পরগণা।

চিঠিপত্র

নিদ্রিত হিন্দু

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। জয়জয়কার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। অনেকেই বলে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বামফ্রন্ট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জোটবদ্ধভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। তাই বামফ্রন্ট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। কথাটা আংশিক সত্য, সর্বাংশে নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ২৭ শতাংশ। তাহলে বাকি ৭৩ শতাংশ জনসমষ্টির ভোট নির্বাচনে কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস তারাই পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের নিয়ন্ত্রক। তারাই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছে, তারাই তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের ইমাম পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি বা কারি ফজলুর রহমানের এত দম্ভ, এত ঔদ্ধত্য। এটা সংক্রামিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুব সমাজের মধ্যেও। তারই প্রতিফলন রাস্তায়, বাজারে, অফিসে, দোকানে সর্বত্র। প্রকাশ্যে বাজারে সবুজ কাপড়ে ধর্মীয় ইঙ্গিতে, তোলা আদায় করছে দোকানিদের কাছ থেকে। নির্বিবাদে দোকানিরা দিয়েও দিচ্ছে। কি দরকার ঝামেলা করে! এবার সম্ভবত বাড়িতে বাড়িতে শুরু হবে। ঈদ বা মহরমের সময় দোকানে দোকানে চাঁদা আদায় তো বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, ছিনতাই, রাহাজানি এখন প্রাত্যহিক সংবাদে পরিণত হয়েছে। বেছে বেছে সেই সংবাদগুলিই সংবাদপত্রে স্থান পায় যেখানে 'নাটেরগুরুরা' সংখ্যালঘু, সম্প্রদায়ের নয়। এখন ফাঁকা বাড়িতে একা পেয়ে, নাবালিকাকে ধর্ষণ করা বা রাস্তায় একা পেয়ে তরুণীকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এখন শুরু হয়েছে নতুন উপদ্রব। মন্দিরে সন্ধ্যারতি সন্ধ্যাবেলা করা চলবে না, কারণ সেটা নমাজের সময়। অতএব সন্ধ্যারতি বিকেলের মধ্যেই সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, স্থানীয় পুলিশ সেইরকম নির্দেশই দিয়েছে স্থানীয় মুসলমানদের নির্দেশ অনুযায়ী। ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা সন্নিহিত এলাকার একটা হিন্দু মন্দির। এটা, পুলিশ প্রশাসনও সেইমতো নির্দেশ দিয়েছে— বিকেল ৪টে সাড়ে ৪টের মধ্যেই সন্ধ্যারতি সমাপ্ত করতে হবে। নামাজে বিঘ্ন ঘটানো চলবে না। এবার থেকে এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে। আরও আছে। যেখানেই ফাঁকা জমি পড়ে আছে, হিন্দুরা বিভিন্ন পুজো করে থাকে, অন্য সময় ছেলেরা খেলাধুলো করে, সুবিধে মতো সেগুলো নিজেদের জমি বলে মুসলমানরা দাবি করছে এবং ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। সরলার্থ, হিন্দু পুজো বন্ধ করে মসজিদ গড়ে তোলা। হিন্দু এখনও হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই-য়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। হিন্দুরা কি চিরকাল নিদ্রিত থাকবে?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর, হুগলী।

‘বেঙ্গল লীডস’—শিল্প সম্মেলন, না শিল্পমেলা?

ধীরেন দেবনাথ

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী হ্যাট্রিক করার পর গুজরাতবাসী বুঝিয়ে দিলেন— ভবিষ্যৎ ভারতের নেতা মোদীই। তবে তাঁর জয় যে শুধু হিন্দুত্বের পথ ধরেই এসেছে তা কিন্তু নয়। তাঁর জয় এসেছে মূলত উন্নয়নের পথ ধরে। তাই জাতি-ধর্মনির্বিশেষে অধিকাংশ গুজরাতবাসী তাঁকে ভোট দিয়েছেন। শুধু সংবাদ মাধ্যমই নয়, নরেন্দ্র মোদীর ঘোর বিরোধীও এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারছেন না! নির্বাচনী ময়দানে সেকুলারবাদী দলগুলি যেখানে জনগণকে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বা তোষণের জিগির তোলে সেখানে মোদী গুজরাতবাসীর উন্নয়নের কথা বলে করেছেন বাজিমাত। গুজরাতে উন্নয়ন ও নরেন্দ্র মোদী সমার্থক। তিনি আজ বিকাশ পুরুষ। শিল্পপতিদের কাছে সত্যিকারের শিল্প সমঝদার।

‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাত’ (Vibrant Gujarat) অর্থাৎ, চনমনে গুজরাত। একটি সম্মেলন। শিল্পপতিদের নিয়ে। সেই ২০০৩ সালে শুরু। দু’ বছর অন্তর। এবছর ষষ্ঠবার। অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরের বিশাল প্রান্তরে। রতন টাটা, অম্বানী ভ্রাতৃদ্বয়, আদি গোদরেজ, আনন্দ মাহীন্দ্র, অনিল অগ্রবাল, বেণুগোপাল ধুত, কুমারমঙ্গলম বিড়লা, বাবা কল্যাণী, সাইরাস মিস্ত্রি, শশী রুইয়া, চন্দা কোচ্চার, আর সি ভড় (মারুতি চেয়ারম্যান), গৌতম আদানি, প্রসূন মুখোপাধ্যায় (অনাবাসী বাঙালী) —কে ছিলেন না সম্মেলনে! হাজির ছিলেন বৃটেন, চীন, জাপান, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ, এক পাকিস্তানি বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদলও। গোধরা দাঙ্গা প্রশ্নে আসেননি কোন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, শিল্পপতি বাণিজ্যিক প্রতিনিধি। প্রত্যেকেই ছিলেন মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মুকেশ আম্বানী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘‘নরেনভাই, আমি কিন্তু ছ’টা সম্মেলনেই হাজির ছিলাম। একশ’ শতাংশ উপস্থিতি।’’ আর রতন টাটা কী বললেন? বললেন, ‘‘আমি আগে একবার এই সম্মেলনে এসে বলেছিলাম, যে গুজরাতে বিনিয়োগ করবে না সে মূর্খ (স্টুপিড)। আমি নিজেও তো একবার মহামূর্খই ছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি বোকা নই। তাই সঠিক স্থানে বিনিয়োগ করছি।’’ বৃটেন আগেই মোদীর উপর থেকে ‘বয়কট’ তুলে নিয়েছিল। এখন আমেরিকাকেও বোঝাচ্ছে, ‘বয়কট’ পথ থেকে সে যেন সরে আসে। তা না হলে যে আমেরিকারই ক্ষতি। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত জেমস ডেভান স্বীকার করেছেন, গুজরাতের আর্থিক বৃদ্ধির হার (Economic Growth Rate) চীনের থেকেও বেশি। গোটা দেশের থেকেও বেশি। মোদীর দাবি, সেটা ১০ শতাংশের থেকেও বেশি। মঞ্চে তো কে কত বড় গুজরাতি তা প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন রতন ও মুকেশ। মুকেশ বলেছেন, ‘‘স্বাক্ষর হয়েছিল ৭৬টি এবং বিনিয়োগ ছিল ৬৬০৬৮ কোটি টাকা।’’

পক্ষান্তরে আজ সেটা বেড়ে হয়েছে ৮, ৩৮০টি এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ২০৮৩০৪৭ কোটি টাকা। টাটা কেমিক্যালস্ গুজরাতে ৩৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী ১০.১.১৩-তে উদ্বোধন করেছেন ভারতে প্রথম Global Financial Hub-এর, যার নাম Gift City। ২৮ তলা বিশিষ্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ টাওয়ার। ৮৮৬ একর জমির উপর নির্মিত ৭৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। এখানে দশ লক্ষ চাকরির সংস্থান হবে। অনিল আম্বানি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন— নরেন্দ্র মোদীই হতে পারেন দেশের নেতা। রাশিয়ার এক কূটনীতিকের মন্তব্য নরেন্দ্র মোদী আজ মুখ্যমন্ত্রী। এবার লড়াই প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য। তবে সবার মুখে ছিল নরেন্দ্র মোদীর ‘জাতীয় নেতা’ হয়ে ওঠার কথা। এত সবের পরেও গুজরাত চনমনে হবে না?

অন্যদিকে, ‘বেঙ্গল লীডস’ (Bengal Leads) অর্থাৎ বাংলা পথ দেখায়। হলদিয়ায় অনুষ্ঠিত এই শিল্প সম্মেলন শেষ। কিন্তু এ কোন্ শিল্প সম্মেলন? শিল্পপতি কই! টাটা, বিড়লা, আম্বানি, মাহীন্দ্রা, প্রেমজি, কৃষ্ণমূর্তিরা কই! মাঝারি মাপের শিল্পপতিরাও প্রায় অনুপস্থিত। বিবেক অগ্নিহোত্রী (অম্বুজা সিমেন্টস্ লিঃ), প্রসূন মুখোপাধ্যায় (অনাবাসী)-সহ দু’একজন ছাড়া কেই-বা আর ছিলেন? হ্যাঁ, ছিলেন আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, রাশিয়ার প্রতিনিধিরা। ছিলেন চীন, জার্মানির কনসাল জেনারেলরাও। রাশিয়ার হব (HOBHK) পি এল সি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি এলেকোই বুলিনিন আগ্রহ দেখিয়েছেন রাজ্যে গভীর সমুদ্র বন্দর নিয়ে। অন্যরা শ্রোতা-দর্শকমাত্র। আসলে সিঙ্গুর থেকে টাটা ও হলদিয়া থেকে এ বি জি (ABG) গোষ্ঠীর দুঃখজনক বিদায়ের পর আর কোন্ শিল্পগোষ্ঠী বা উদ্যোগপতি সাধ বা সাহস করে এ রাজ্যে পুঁজি ঢালতে রাজ্যমুখো হন? কাজেই ‘বেঙ্গল লীডস’-কে শিল্প-সম্মেলন না বলে বরং শিল্পমেলা বা প্রদর্শনী বলা যেতে পারে। এই মেলায় স্টল বসেছিল ৭২টি। ৩৩টিই ছিল সরকারি দফতরের। স্টলগুলিতে বিক্রি হচ্ছিল ধূপকাঠি, বই, সয়াবিন টুকরো বা চিপসের প্যাকেট, সানফ্লাওয়ার তেল, মাদুর, ডোকরা, শাড়ি ইত্যাদি। ছিল B 2 B (Business to Business) প্রদর্শনী, গানের আসর আর উন্নয়নের পেল্লায় ফানুস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন, দেখলেন, কিন্তু জয় করতে পারলেন না। তবে মঞ্চ মাতালেন উন্নয়নের ফিরিস্তি, বাম জমানার অপশাসন, এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের গুজরাত নিয়ে ওকালতি, গুজরাতের সঙ্গে তুলনা না টানার কথা শুনিয়ে ও স্বভাবসুলভ রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে। শিল্পটানার কোনও কথাই প্রায় বলেননি। আর বলবেনই বা কেন? শিল্প নিয়ে যে তাঁর কোনও আগ্রহই নেই। তাই শিল্পের জন্য এ রাজ্যে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি বা পরিকাঠামো নির্মাণেও তাঁর আন্তরিকতাও নেই। সে কারণেই গুজরাত যা পারে বাংলা তা পারে না। সত্যি বলতে, বাংলা একদা শিল্পে ছিল দ্বিতীয়। আর আজ? বাম-ডান অপশাসনে তার ঠাঁই হয়েছে তলানিতে। এরপরেও ‘বেঙ্গল লীডস্’? আজ গুজরাতের গান্ধীনগরে যখন বিনিয়োগকারীদের ‘চাঁদের হাট’, বাংলার হলদিয়ায় তখন ‘অমাবস্যা’। তবে মমতার একটাই সান্ত্বনা রবীন্দ্রসংগীত— ‘‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।...’’

কাকচক্ষু-বিশারদ

নবকুমার ভট্টাচার্য

বীরভূম জেলার তারাপীঠে গেলে এখনও এমন কিছু লোকের দেখা মেলে যাঁরা কেবল দু এক মিনিট দেখেই নামধাম গোত্র বলে দিতে পারেন। যাত্রীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। লোকটা তো চেনে না তাহলে নামধাম বলে দিচ্ছে কীভাবে। যুক্তিবাদী যাঁরা তাঁরা বলেন, আগে কোথাও দেখেছে নিশ্চয়। আসলে এই বিদ্যাটি হচ্ছে কাকচক্ষু বিদ্যা। যাঁরা এই বিদ্যাটি চর্চা করেন তাঁদের কাকচক্ষু বিশারদ বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই বিদ্যাটি সম্পূর্ণ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাতেই আমরা বিস্ময় প্রকাশ করে থাকি। কাকচক্ষু বিশারদেরা মানুষের অতীত বলতে পারতেন কিন্তু ভবিষ্যৎ নয়। কারণ মানুষ পুণ্যকর্মের ফলে, দৈনিক আচার অনুষ্ঠান, জপতপ পুজো পাঠের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যতের কর্মফল নিজেরাই অনেকটা বদলে দিতে পারেন। পিতামাতা গুরুজনপ্রমুখদের আশীর্বাদে আগামীদিনের চরম বিপদও অনেক সময় কেটে যায়। এছাড়া জন্ম মৃত্যু বিবাহ সম্বন্ধে দেবতারাও স্বয়ং যেখানে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন না, সেখানে অন্যেরা পারবেন এমন ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় ধারণা রয়েছে জাতকের জন্মের ষষ্ঠদিনে বিধাতাপুরুষ নাকি তার কপালে ভাগ্যফল লিখে দিয়ে যান। এজন্য এখনও কোন কোনও গৃহস্থ

জাতকের ষষ্ঠ দিন রাতে প্রদীপ জ্বেলে একটি পীড়ির উপর দোয়াত কলম এবং এক খণ্ড তালপাতা দিয়ে রাখেন। জনশ্রুতি, বিধাতাপুরুষ গভীর রাতে জাতকের ভাগ্যলিপি এই তালপাতায় লিপিবদ্ধ করেন। আমরা বিধাতা পুরুষের এই ললাট লিখন নিয়েই বড় হই। হস্তরেখাবিদ জ্যোতিষীরা যেমন হাতের রেখার অবস্থান দেখে ভাগ্যফল বলেন, কাকচক্ষু বিশারদেরাও তেমন কপালের রেখা দেখে মানুষের অতীত ও বর্তমানের অবস্থান বলতে পারতেন।

কাক যেমন একভাবে দৃষ্টি দিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করেন, কাকচক্ষু বিশারদরাও তেমনি ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ললাটের রেখায় মানুষের অতীত জীবনের ঘটনাবলী, বর্তমানের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান।

আসলে এই বিদ্যা হচ্ছে গারুড়িক বিদ্যা। যোগীরা অনেকটা এই বিদ্যার সাহায্যেই মানুষের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেখতে পান। কীভাবে একজন মানুষের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি দেখা সম্ভব? উপনিষদ তার অবস্থানের হদিস দিয়েছে— 'বিদ্ধি ত্বম্ এতৎ নিহিতং গুহায়াম্'। এই গুহায় রয়েছে এক আশ্চর্য আলো— 'তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদ্ আত্মবিদো বিদুঃ।' এখানেই মন্ত্রযোগের উপযোগিতা। তন্ত্র শাস্ত্রেও বলা হয়েছে— আমাদের শরীরে যে ষট্‌চক্র রয়েছে সেখানে আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে রয়েছে সহস্রার। ওই সহস্রারেই নিরাকারা মহাজ্যোতি-স্বরূপিণী নিজেকে মায়াচ্ছাদিত করে চণকাকারে অবস্থান করছেন। আমাদের সাধারণ জীবের মনের ছবিটি দর্শন করাই কাকচক্ষু বিশারদের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁরা আত্মসাক্ষাৎকার করেননি, তাঁরা কিছুতেই অপরের মনের ছবি দর্শন করতে পারেন না। দেহের ভিতর যিনি রয়েছেন তিনি আনন্দস্বরূপ। প্রত্যেক দেহের ভেতরই তিনি রয়েছেন। প্রত্যেকের স্বরূপই হলো তাই। কাকচক্ষু বিশারদেরা এই স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারতেন। বর্তমানে এই বিদ্যাজানা লোকদের আর দেখা মেলে না। জাগতিক বিদ্যা শেখা সোজা। বড় দার্শনিক হওয়া, কি বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া, বড় কবি কি চিত্রকর, কি বড় রাজনীতিজ্ঞ হওয়া— এ বরং সোজা। কিন্তু অপরের অতীত বর্তমান সম্পর্কে সঠিক ভাবে বলা বড় কঠিন। এ বিদ্যা গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর অভাবে তাই এ বিদ্যার অবলুপ্তি ঘটেছে।

এই বিদ্যার লোকেদের পূর্বে বেশি করে দেখা পাওয়া যেত বৈদ্যনাথ ধামে। কিন্তু বর্তমান ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথে এই বিদ্যা জানা লোকদের আর দেখা মেলে না। বীরভূম জেলার তারাপীঠে দু-একজনের দেখা মিললেও সম্পূর্ণ এই বিদ্যা তাঁরাও জানেন না। অথচ মাত্র শতবর্ষ পূর্বেও বীরভূম দুমকা বৈদ্যনাথধামে কাকচক্ষু বিশারদদের রমরমা বাজার ছিল।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

ঐতিহাসিক দুর্গ

গোয়ালিয়র

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন, শক্তিশালী ও সুবৃহৎ দুর্গগুলির অন্যতম হলো মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত গোয়ালিয়র দুর্গ। বিদেশিরা ''ভারতের জিব্রাল্টার'' এবং ''হিন্দুস্থানের দুর্গরূপী রত্নমালার মুক্তো'' প্রভৃতি আখ্যায় গোয়ালিয়র দুর্গকে করেছেন বিভূষিত, যা থেকে দুর্গের সুদৃঢ়তা ও রণকৌশলগত সুগম অবস্থান স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ বেলেপাথরের পর্বত ''গোপাচল''-এ অবস্থিত গোয়ালিয়র দুর্গ, লম্বায় পৌনে দুমাইল চওড়ায় ৬০০-২৮০০ ফিট এবং ৩০ ফিট উঁচু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

দুর্গে প্রবেশের মূল দুয়ারগুলো হলো— ''গোয়ালিয়র দরওয়াজা'', ''গণেশ দরওয়াজা,'' প্রাচীন মহল, মন্দির, অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পীদের সৃজনশীলতা ও দক্ষ শিল্পনৈপুণ্যর পরিচয় দেয়। দুর্গের প্রধান প্রাসাদটি হলো রাজা মানসিংহের প্রাসাদ ''মানমন্দির''। দুর্গের অন্যতম অনুপম অট্টালিকা হলো ''গুজরী মহল'', বর্তমানে দুর্গের সংগ্রহশালা রূপে ব্যবহৃত হয়। দুর্গের অন্যতম দর্শনীয় মহলগুলি হলো— জাহাঙ্গীর মহল, কর্ণমহল, বিক্রমমহল প্রভৃতি। মন্দিরময় দুর্গ চত্বরের প্রধান মন্দিরগুলি হলো— ''সাধু গোয়ালিয়া মন্দির'' ''চতুর্ভুজ বিষ্ণুমন্দির'', জোড়া সাঁসবহু মন্দির (বিষ্ণুমন্দির), দ্বাদশ শতাব্দীর সুবিশাল ''তেলীমন্দির'', দেবীমাতার মন্দির, জৈন তীর্থঙ্করদের উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির। দুর্গের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থলগুলি হলো জৌহর কুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, সিন্ধিয়া রাজবংশীয়দের জন্য নির্মিত বিদ্যালয়, মুঘলদের ''বন্দিশালা'' রাজা ভীমসিংহের ছতরী ও গুরুদ্বার ''বন্দিছোড়'' প্রভৃতি।

সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা সুরুজসেন সন্ত গোয়ালিয়া বা গালবের প্রেরণায় এই ঐতিহাসিক দুর্গের নির্মাণ করেন। কালক্রমে গোয়ালিয়র দুর্গ হুন, কচ্ছবাহ, প্রতিহার, তোমর, পাঠান, মুঘল, মারাঠা এবং ইংরেজদের অধিকৃত হয়। কচ্ছবাহ রাজা কীর্তিরাজের নেতৃত্বে রাজপুত সৈন্যদল ১০২৩ খৃস্টাব্দে সুলতান মাহমুদের প্রবল আক্রমণের প্রতিরোধ করেন। মাহমুদ রিক্ত হস্তে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। ১১৯৬ খৃস্টাব্দে দিল্লীর প্রথম তুর্কী সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবক দীর্ঘদিনের দুর্গ অবরোধ ও কঠিন সংঘাতের পর গোয়ালিয়র দখল করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিহার সামন্ত বিগ্রহরাজ মুসলীম সৈন্যদলকে পরাস্ত করে গোয়ালিয়রে নিজ আধিপত্যের স্থাপনা করেন। ১২৩২ সালে সুলতান ইলতুৎমিস বিশাল সৈন্যসহ গোয়ালিয়র আক্রমণ করলে প্রতিহার রাজপুতগণ অসীম পরাক্রমে তার প্রতিরোধ করেন। ভয়ংকর সংগ্রামের শেষে দুর্গ মুসলমানদের অধিকৃত হয়। দুর্গের রাজপুত রমণীগণ পবিত্র ''জৌহরের'' অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। ১৩৬৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর ''সুলতানী সাম্রাজ্যের'' সংকটের সুযোগ নিয়ে তোমর বংশীয় রাজা বীরসিংহদেব গোয়ালিয়র নিজ অধিকারভুক্ত করেন। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে তোমর রাজপুতগণ দিল্লীর মুসলমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বীর বিক্রমে মোকাবিলা করেন। বীরকেশরী মহারাজ মানসিংহের (১৪৮৬- ১৫১৬) শাসনকাল ছিল গোয়ালিয়রের স্বর্ণযুগ। মধ্যভারতের এই হিন্দু রাজ্য স্থাপত্য, শিল্প, বাস্তুকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তার চরম উৎকর্ষতায় উপনীত হয়। মানসিংহ সুলতান সিকন্দর লোদীর আক্রমণও পর্যদুস্ত করেন। অতঃপর গোয়ালিয়র লোদী, মুঘল ও পাঠানদের অধিকৃত হয়। ১৫৫৩-৫৬ সালের মধ্যে বীরচূড়ামণি হিন্দু সেনাপতি হেমচন্দ্র বা ''হেমু'' গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে আফগান ও মুঘলদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বাইশটি যুদ্ধে বিজয়লাভ করেন। ১৫৫৮ সালে বাদশা আকবর গোয়ালিয়র নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রায় দুশো বছর যাবৎ গোয়ালিয়র মুঘলদের বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদীয়মান শিখ সম্প্রদায়ের শক্তি খর্ব করতে মুঘল বাদশা জাহাঙ্গীর ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দজীকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করেন। মহান সাধক হরগোবিন্দের উপস্থিতি গোয়ালিয়র দুর্গের বন্দিশালার নারকীয় পরিবেশকে এক ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে পরিণত করে তোলে। কিছু সময় পশ্চাৎ গুরুজীর ঐশী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাদশাহ জাহাঙ্গীর গুরু হরগোবিন্দজী এবং গুরুজীর প্রতি সমর্পিত বাহান্নজন রাজপুত রাজাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। এই অভূতপূর্ব ঘটনার স্মরণে দুর্গচত্বরে নির্মিত হয় গুরুদুয়ার ''বন্দিছোড়''। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর অষ্টাদশ মধ্য ও শেষার্ধে গোয়ালিয়রে বীর মারাঠা সেনানায়ক মাধবরাওয়ের নেতৃত্বে সিন্ধিয়া রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়। ১৮৫৭-৫৮ খৃস্টাব্দে ''মহাবিদ্রোহের'' সময়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপে ও রাও সাহেবের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সৈন্যদল অবরোধ করে গোয়ালিয়র দুর্গ। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সিন্ধিয়ার বিদ্রোহী বাহিনী। ইংরেজদের বশংবদ জীয়াজীরাজে সিন্ধিয়া দুর্গ ত্যাগ করেন, গোয়ালিয়র বিদ্রোহীদের অধিকৃত হয় এবং ৩ জুন ১৮৫৮-তে দুর্গে রাও সাহেবের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হয়। জেনারেল হিউরোজের নেতৃত্বে বিশাল বৃটিশবাহিনী গোয়ালিয়রে প্রবল আক্রমণ চালায়। দুদিন যাবৎ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। দুর্গ পুনরায় ইংরেজদের অধিকৃত হয়। প্রায় তিরিশ বছর পর দুর্গটি সিন্ধিয়া রাজবংশকে তার আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ পুনরায় সমর্পণ করা হয়।

ভারতের ইতিহাসের বহু উত্থান ও পতনের সাক্ষী গোয়ালিয়র দুর্গ আজও পূর্ণ গরিমা এবং গৌরবের সঙ্গে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান।

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

রবীন সেনগুপ্ত

সীতারামদাস বাবা ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ইংরাজী ১৮৯২ খৃস্টাব্দে ব্যান্ডেলের কেওটা গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বামী প্রণবানন্দ ও শ্রীল প্রভুপাদের চেয়ে চার বৎসরের বড় ছিলেন। দীর্ঘায়ু ওঙ্কারনাথজী নব্বই বৎসর জীবিত থেকে অজস্র মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে, প্রচুর গ্রন্থ রচনা ও সমাজসেবামূলক কাজ করে অসংখ্য অনুরাগী রেখে গিয়েছেন।

রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক ও রামমন্ত্রের সিদ্ধ সাধক সীতারামজী খোদ অযোধ্যাতে বেদ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান অবধি করে গিয়েছেন। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সহ বহু সংস্কৃত জ্ঞানী ও নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সীতারামজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন। হিন্দু শাস্ত্রসহ নানা বিষয়ে পি. এইচ. ডি. ও মাস্টার ডিগ্রি করা এত সংখ্যক শিষ্য সম্ভবত সীতারাম ওঙ্কারনাথজী ছাড়া আর কারও নাই। উচ্চশিক্ষিত শিষ্য সকল গুরুরই রয়েছে কিন্তু শাস্ত্রশিক্ষিত মহলে এতখানি সাড়া জাগাতে সীতারামজীই ছিলেন সর্বাধিক সফল।

ওঙ্কারনাথজী শৈশবেই মাতৃহারা হওয়ায় বিমাতার ক্রোড়ে বেড়ে ওঠেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি শিবের সাক্ষাৎ লাভ করেন ব্রজনাথ নিকেতনে জানালার বাইরে। একুশ বছর বয়সে তিনি দীক্ষালাভ করেন রামানন্দী সাধক শ্রীমদ্ দাশরথিদেব যোগেশ্বরের কাছ থেকে। চব্বিশ বছর বয়সে ওঙ্কারনাথ বিবাহ করেন। তার দু'বছর বাদে চুঁচুড়ার ভূদেব পাঠশালার দোতালায় পুনরায় শিব তাঁকে পার্বতী সহ দর্শন দান করে কানে মন্ত্র দিয়ে যান। সীতারামজীর বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। দিব্য উন্মাদনা চলে আসে। এরপরও একাধিক স্থানে দেব দর্শন হয়।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে ডুমুরদহে শ্রীরামশ্রমে সাধন গুহা খনন করে সমাধিতে চলে যান ওঙ্কারনাথ। তারপর পুরীধামে জগন্নাথদেবের আদেশ পেলেন ১৩৪৪ সালের ১০ বৈশাখ। আদেশ অনুযায়ী নামসংকীর্তন ও শাস্ত্র প্রচার করে বিপুল সাফল্য লাভ করতে লাগলেন তিনি। প্রায় সারা দেশেই ভ্রমণ করে ৬৪টি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন সীতারামদাস। চাতুর্মাস্য

ব্রত পালন, লঘু যজ্ঞ, বিষ্ণু যজ্ঞ, রুদ্র যজ্ঞ, চণ্ডী যজ্ঞ, অন্নদান, বস্ত্রদান, নামমন্ত্রদীক্ষা দান, আরোগ্য দান, অভাব মোচন ইত্যাদি কাজ করেছেন সারাজীবন ব্যাপী। নিরাধারা দীক্ষা, জ্ঞানবতী দীক্ষা, বৈধ দীক্ষা, সাম্ভবী দীক্ষা দানের মাধ্যমে বহুজনকে আধ্যাত্মিক মার্গে কর্মক্ষম করে তোলেন ওঙ্কারনাথজী।

তিনি লিখতে খুবই ভালবাসতেন। অনেক সময় যোগের আবেশে লিখে যেতেন কোনও রকম যতিচিহ্ন ছাড়াই। তাঁর রচিত অধ্যাত্ম গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো— অভয়বাণী, সুধারধারা, মহারসায়ন, শ্রীশ্রী নামাকৃত লহরী, কথারামায়ণ, মকারবাবা, শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত, গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদের ভাষ্য।

এইসব গ্রন্থের মধ্যে গীতা গ্রন্থটি আধুনিক ছন্দহীন কবিতার ধরনে রচিত হওয়ায় আধুনিক ভাবধারায় আবৃত্তি করার সুবিধা হয়। শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত গ্রন্থটির ভাবধারাও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নতুনত্বের আস্বাদ নিয়ে আসে। এছাড়াও ওঙ্কারনাথজী হিন্দি, বাংলা, সংস্কৃত, ওড়িয়া, তেলুগু, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় ১২টি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

তিনি তাঁর সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিষ্যদের বিশেষ আধ্যাত্মিক নামকরণ করে তার পূর্বে কিঙ্কর শব্দটি ব্যবহার করতেন। কলকাতায় মহামিলন মঠ থেকে সীতারামজীর আদর্শ প্রচার করা হয়। মহামিলন মঠটি মুখ্য কার্যালয়ের মতোই। এর ঠিকানা ৭/৭ পি. ডব্লু. ডি রোড, কলকাতা-৩৫। এছাড়াও বাংলার আরও অনেক স্থানে ওঙ্কারনাথ আশ্রম ও আর্যনারী মন্দির রয়েছে।

ওঙ্কারনাথজী অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টা দ্বৈত প্রভৃতি কোনও মতকেই খণ্ডন করেননি। উনি বলতেন এসব মতই সাধনার এক একটি স্তর।

তিনি রাষ্ট্রীয় সমস্যা থেকেও দূরে মুখ ফিরিয়ে থাকতেন না। ভারত-চীন যুদ্ধের সময়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, ইরাক ইরান যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে ধ্যানযজ্ঞ করেছিলেন। দিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত সর্বধর্ম সম্মেলনে তার ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। মা আনন্দময়ী, শ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখরা ওঙ্কারনাথজীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। মহামিলন মঠে একবার তিনি নিজে একটি একাঙ্ক নাটকে অভিনয় করে ভক্তদের চমৎকৃত করেছেন।

এই মহাসাধকের প্রয়াণ ঘটে ১৯৮২ খৃস্টাব্দে বালিগঞ্জ লেক কালীবাড়ির পাশে বৈকুণ্ঠ ভবনে।

তাঁর জীবন ও বাণী নিয়ে মেজর জেনারেল সুজান সিং উবানের গুরুস্ অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে, কিঙ্কর শরণানন্দের রচনায়, শ্রী প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, ডঃ নির্মল কুমার পানিগ্রাহী, রামানুজ জীয়র, পরাঙ্কুশ স্বামী, ডঃ সুখেন্দু বাউর, শ্রী অমরনাথ দে প্রভৃতিদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণায় প্রভূত তথ্য পাওয়া যায়।

হোতু-কোতু উপাখ্যান

সরস্বতী পুজোর স্মৃতি

হোতুর খুব ভালো লাগে সরস্বতী পুজোর সময় ছোটোদের দেখতে। কত খুশি তাদের। নিজের পুরনো দিনে ফিরে যেতে চায় মাঝে মাঝে। বাবা বলতো, 'সরস্বতীকে রোজ প্রণাম করতে হয়। আর পড়াও চাই প্রতিদিন।' ছোটোদের বই উপহার দিতো। বাড়িতে সকলে মিলে খিচুড়ি খাওয়ার আনন্দ অন্যরকম। মিষ্টি কুল আর কদমা তিলেপাটালি প্রসাদে থাকতই।

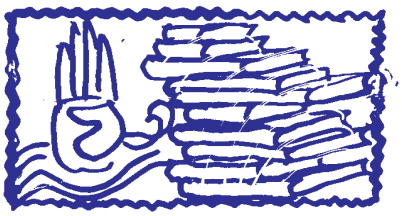

কদমা খাওয়ার মজা ছিল। ঠাকুমা বড় বড় কদমা দিত। সরস্বতী পুজোর সব আনন্দ যেন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। বিকেলে বাড়িতে বা আশপাশে কোথাও গান-বাজনার আসর বসত। ছোটোরা বড়োরা অংশ নিত। হোতু দেখেছে ঠাকুমা আবৃত্তি করেছে। দাদু এসরাজ বাজিয়েছে। বড়জ্যাঠা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছে। জেঠিমা আর মা পর পর গান গেয়েছে কোনও বই খাতা না দেখে। সকাল থেকে দুজনে কত খেটেছে। বাবা সব অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেছে। ছোটোরা প্রত্যেকে কিছু-না-কিছু করেছে। নাচ-গান-আবৃত্তি। ঠাকুমা প্রত্যেকের জন্যে আনিয়ে রাখত বই খাতা কলম। বই আলাদা আলাদা। সকালে রাতে মা জেঠিমা নানারকম গোটা আনাজ সেদ্ধ করেছে বাড়ির সব থেকে বড় হাঁড়িতে। মটরশুঁটি পালংশাকের গোড়া মুগকলাই দেওয়া রীতি আনাজের সঙ্গে। ভালো করে ধুয়ে যথেষ্ট জলে সব সেদ্ধ করা হোত অল্প আঁচে সারা রাত ধরে। এর নাম 'গোটাসেদ্ধ'। দাদু বলেছিল, 'এই সময় আনাজপাতি প্রচুর হয়, দামও কম থাকে। ব্যাপারটা স্বাস্থ্যকর বলেই খাওয়া। উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' ঠাকুমা গোটাসেদ্ধ মেখে ডাক দিত সকলকে। বাটিভর্তি গোটাসেদ্ধ খাওয়ার মজা আলাদা। বাবা মাখা পছন্দ করত না। সব আনাজ সেদ্ধর পর কেমন লাগছে তা দেখাত ছোটোদের। তেল নুন দিয়ে মাখত। নিজে খেত, অন্যদেরও দিত। দাদু বলত, 'সরস্বতীর বিসর্জন হয় না। যাঁকে রোজ প্রণাম করতে হবে তাঁর বিসর্জন হতে পারে না।' বাড়িতে একটা ছোট্টমাপের, দেড়ফুট বড়জোর, সরস্বতী মূর্তি ছিল পাথরের। দাদুর এক ভাস্কর বন্ধুর উপহার। সেই মূর্তির সামনে কত সুন্দর আলপনা দেওয়া হোত। দুটোদিন নানান্ মজায় ভরা থাকত। মূর্তিটা থাকত সারা বছর ঠাকুর ঘরে। সরস্বতী পুজোর সময় নামিয়ে আনা হোত বসার ঘরে।

হোতুদের বাড়িতে এখনও পুজো হয়। সেই একই মূর্তি। ছেলেবেলার স্মৃতি একেবারে সিনেমার রিলের ফ্রেমের মতো একটার পর একটা ভেসে ওঠে। ভার হয়ে ওঠে মন। কবে ছেলেবেলার দিন চলে গেছে। কত আপনজন চলে গেছে একের পর এক। বাড়িতে অদলবদল হয়েছে অনেক। সেই পাথরের সরস্বতী মূর্তিটা এখনও রয়েছে। যেভাবে আগে পুজো হোত, এখনও সেভাবেই আয়োজন হয়। তবে ছোটোবেলার ছবিগুলো মেলাতে পারে না। পুজো হয়, হইচইও চলে। সন্ধেবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনেক বছর বন্ধ। সকলে অংশ নিতে না চাইলে কি করা যাবে! হোতু চেষ্টা করেছিল, প্রায় সকলেই অন্য কাজ আছে বলেছে। অর্জুন বলেছিল তাদের বাড়িতে পুজো হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যায় সকলে মিলে। হোতু জানিয়েছিল, 'তুমি ব্যবস্থা করো যাবো। থাকবো।' অর্জুন ডেকেছিল পথশিশুদের। তাদের নিয়ে কাজ করছে সে।

সুন্দর করে সাজানো মঞ্চ। ছোটোদের তালিম দেওয়া হয়েছিল আগেই। তারা মনভরানো অনুষ্ঠান করল। হোতু প্রত্যেকের জন্যে কিনে রেখেছিল বই কলম খাতা। ঠাকুমা যেমন তাদের দিত ছেলেবেলায়। প্রত্যেকের জন্যে খাবারের প্যাকেটের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেকের হাতে সরস্বতীর সুন্দর ছবি ছাপা কার্ড উপহার দিল অর্জুন। হোতু একটু অবাক চোখে তাকাল অর্জুনের দিকে। হাসল। হোতুদের বাড়িতে সরস্বতীর যে মূর্তিটার পুজো হচ্ছে এত বছর ধরে তারই ফোটোগ্রাফ তুলে কার্ড তৈরি করেছে অর্জুন। ছাপা হয়েছে কয়েকটি কথা : 'আমাদের প্রত্যেকের জীবনে জুড়ে থাকুন সরস্বতী। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমরা এগিয়ে চলবো প্রতিদিন।'

হোতুর মন ভরে গেলো কার্ড পেয়ে। তার দাদুও ওই কথা বলতেন।

কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

মুন্নিদিদির সঙ্গে বইমেলায় ঘোরা

পল্লবকে খুব ছোটোবেলা থেকে বই দেয় মুন্নিদিদি। অবশ্য 'পল্লব' ডাকে না মুন্নি। বলে 'কাচু'। কেন কাচু বলে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। মুন্নির ভালো নাম সংহিতা। তার দাদা রাজর্ষির ডাকনাম বাবু। দুজনেই পল্লবের পিসতুতো দাদা-দিদি। ছোটো পিসির ছেলেমেয়ে। পিসি একটা স্কুলে সংস্কৃত পড়ায়। পিসেমশাই ডাক্তার। এক মেডিক্যাল কলেজে পড়াত। বাড়িতে প্রচুর বই। পল্লব দেখেছে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পিসেমশাই পড়াশোনা করে। ডাক্তারি বই পত্রিকা আনায় বাইরে থেকেও। বাবার পড়ার ঘরে মুন্নি ঢুকত ছোটো থেকে। এটা সেটা নিত। বাবা খাতা বই রঙ কিনে দিত ছবি আঁকার জন্যে। বাবার পড়ার টেবিল গোছাত মা। তবে বাবার কড়া হুকুম থাকত, 'বইপত্র সরাবে না।' বাবু পড়ার জন্যে সব জিনিস পেত। মুন্নি যেমন জোর করতে পারত বাবার উপর, বাবু তা পারত না। বাবার কাছে বাবু শুনত, 'পড়াশোনার মতো জিনিস নেই। পড়, নানা জিনিস, মন দিয়ে পড়।'

বইমেলার মাঠে বাবু-মুন্নি গেছে ছোটোমামার সঙ্গে। ঘুরে ঘুরে বই কিনে এটা সেটা খেত। বাবার বারণ ছিল বই কেনায় নয়, কোনও জিনিস খাওয়ায়। মেলার মাঠে ওসব মানলে চলে! শেষে মামার কোলে চড়ত মুন্নি। বাবু-মুন্নি যখন কলেজে পড়ে তখন পল্লব খুব ছোটো। বাবার সঙ্গে সে মাঠে গেছে। পিসির কাছে বই পায় জন্মদিনে আর অন্য সময়ে। সব বই যত্নে আছে। বাবুদা এখন ডাক্তার হয়ে গেছে। বইমেলার মাঠে যায়। তবে পিসেমশাইয়ের মতো পড়ার অভ্যেস তৈরি হয়নি। মুন্নিদিদি প্রচুর বই কেনে। ভালোলাগা বই অন্যদের কিনতে বলে। উপহার দেয়। কাচুকে উপহার দিত বাছাই বই। এখন তাকে নিয়ে মেলার মাঠে ঘোরে। পছন্দের বই কিনে দেয়। ভাইয়ের রুচি আর পছন্দকে তারিফ করে দিদি।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. দেশের সব থেকে পুরনো আদালত ভারতের কোন্ কোন্ শহরে? প্রতিষ্ঠাবর্ষ?

২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কবে থেকে শুরু? এখন কোন্ পরিকল্পনা চলেছে?

৩. স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্যে দুপুরের খাবার দেওয়ার (মিড-ডে মিল) কাজ কবে থেকে শুরু?

৪. কোন্ কোন্ লেখক, নৃত্যশিল্পী ও চিত্রকরকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় জীবনীচিত্র তৈরি করেন?

৫. কোন্ সাহিত্য পুরস্কারে অর্থ মানপত্র উত্তরীয়ের সঙ্গে বাগ্‌দেবীর মূর্তি দেওয়া হয়?

উত্তর ১. মুম্বাই (১৮৬২), কলকাতা (১৮৬২), চেন্নাই (১৮৬২)। ২. ১৯৫১। দ্বাদশ (২০১২-১৭)। ৩. ১৯৯৫ থেকে। ৪. রবীন্দ্রনাথ। বালা সরস্বতী। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৫. ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

ছবিতে তফাত খোঁজা

উলটো পালটা

বাউড়িয়ার জীবন পোড়েল বেশ ঘোড়েল লোক। এমন ভাব করেন যেন কত জানেন। কত নামকরা লোকের সঙ্গে ওঠা বসা। বহু কাজ নাকি তাঁর কথাতেই এগোয় বা পিছোয়। কেউ কেউ আড়ালে বলে 'গুলদক্ষ জীবন পোড়েল/সেইসঙ্গে আস্ত ঘোড়েল।' ট্রেনে বাসে চলার সময় দু-একজন শ্রোতা পেলেই কথার মালা গাঁথা শুরু হয়ে যায়। বাউড়িয়ার কোন খেলা সমিতির মাতব্বর তিনি জানিয়ে দেন। কোন নেতা ফুটবল মাঠের মাপ আর ফুটবলের ব্যাস না জানায় তাঁর সাহায্য না প্রত্যাখ্যানের হিম্মত দেখিয়েছিলেন জানিয়ে দেন। তারপরেই নিজের ভঙ্গিতে রাজনীতির কচকচি শুরু করেন। আশেপাশের অনেকেই তাঁর চেনা না থাকলে সুবিধে। চেনা কাউকে দেখতে পেলেই জীবন পোড়েল চুপ করে যান। কারণ, কেউ বলতে পারে, 'রেকর্ড থামাও জীবন পোড়েল/জানি তুমি দারুণ ঘোড়েল।' তাঁর বক্তৃতা শুনে এক সহযাত্রী বললেন, 'দেখুন, যে মানুষ কাজের, সে কম কথা বলে।' এবার চুপ জীবন।

২

অসীম ঘোষ ব্যস্ত মানুষ। অফিসে যায় দেরি করে।

বেরোয় অফিস থেকে তাড়াতাড়ি। অফিসে নতুন অফিসার এসেছেন বিপুল হাজরা। হাজিরার কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। অসীম এক বন্ধুকে বলল, 'বড় মুশকিলে পড়েছি। যেদিন দেরি হয়ে যায় যেতে সেদিন বিপুল হাজরা আগে হাজির। যেদিন তাড়াতাড়ি যাই সেদিন অফিসার আসেন দেরিতে।' অসীম ঘোষ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোবার জন্যে রোজ একটা করে গল্প ফাঁদে। বিপুল বললেন একদিন, 'এটা আপনার সাত নম্বর গল্পের ফোটো কপি।'

রামগরুড় সংকলিত

সোনার সাতকাহন

বিদিশা ভট্টাচার্য

'সোনা'-কথাটার মধ্যে এক আশ্চর্য কুহক আছে, আভিজাত্য আছে, গরিমা আছে, কোনও কিছুর সম্বন্ধে তুলনা টেনে যখন আমরা বলি 'সোনার মতো'— তখন যে অনুভূতিটা তৈরি হয়, তার মধ্যে মিশে থাকে একপ্রকার উচ্চম্মন্যতার ভাব। শীতকাল মানেই বন্ধনের সময়। বন্ধনের বাহুডোরে বাঁধার সবচেয়ে আগেই আসে সোনা, আর সোনা মানে সোনামণিদের সৌন্দর্যের চাবিকাঠি। মহিলাদের জীবনের সঙ্গে সোনার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই চাবির দ্বারা রহস্যের উদ্‌ঘাটন একটু করা যাক।

মেয়েদের অঙ্গশোভার সঙ্গে গয়না যেমন জড়িয়ে আছে আবার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা রকমের গয়নাও এসেছে। প্রাচীন অলঙ্কারের পাশাপাশি যুগোপযোগী গয়নার রমরমা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে এসে গয়নাও পেয়েছে নতুন রূপ। যেমন মানতসা, ঝাপটা, তাবিজ, টিকলি— এগুলিই সব মুসলিম সমাজের গয়না। আবার ইয়ারিং, ব্রোচ, রিসলেট, নেকলেস, পেনডেন্ট— এ সমস্ত যে বিদেশী তা নাম থেকে বোঝা যায়। বাঙালির ঘরে ঘরে এইসব গয়নার ব্যবহার হয়ে ওঠে অপরিহার্য।

এক এক যুগের মহিলারা একেক রকমের গয়নায় নিজেদের সাজিয়ে তুলতেন। মাথার গয়নায় মূলতঃ মুকুট, ঝাপটা, সিঁথি, টিকলি, টায়রা, কপালপটি, খোঁপায় পুঁটে, ফুলচিরুনি, সাপকাঁটা, বাগান চিরুনি। হরতন, চিড়িতন, চুড়ি, পলিশজাত চিরুনি, প্রজাপতি কাঁটা। কপালে পড়ার জন্য সোনার আর মিনের টিপ পরতেন। এক টাকা দিলে পাওয়া যেত কৌটোভর্তি টিপ। কানে গড়ার জন্য তারঝুমকো, ঢেঁড়িঝুমকো, ফুলঝুমকো, পাশা, কানবালা, কানফুল, তেঁতুল পাতা, পিপুলপাতা, কান, চৌদান, মুক্তো ঝুড়ি, মুক্তোগুছি, মাকরি, দুল, ইয়ারিং ইত্যাদি। নাকে পরা হোত নোলক, নাকছাবি, ছোট নথ, ফাঁদি নথ, টানা আর কদাচিৎ কেশর। গলার অলঙ্কারের কথা বলতে গেলে পিটঝাঁপা বলতেই হয়। পিঠে তিন বা পাঁচ পাট প্রকাণ্ড সোনার গয়না যার বন্ধনটি ছিল গলায়। এরই নাম পিঠঝাঁপা। এরপর কলার, বড় বড় মুক্তোর ৪-৫টি হালি জড়োয়া দিয়ে গাঁথা, মাঝখানে জড়োয়ার টুকটুকি। ২৭টি একছড়া মুক্তোর মালা নাম নক্ষত্রমালা শেলী বা মুক্তোর গোছহার। এছাড়া রয়েছে সীতাহার, সাতনরি, তারাহার, পুষ্পহরি, মুড়কি-মাদুলি ইত্যাদি। কিছুকাল পরে যোগ দিল নেকলেশ, মাপচেন, বিছেহার ইত্যাদি। ওপর হাতের গয়না বলতে তাগা, তাবিজ, বাজু ইত্যাদি। কোমরের গয়নায় বিছে, গোট, চন্দ্রহার, চাবিশিকলি ছিল অন্যতম পায়ের জন্য মল, ঝাঁকমল ঝাঁজমল, তোড়া, চরণপদ্ম, নূপুর আর পাঁইজোড়। পায়ের আঙুলে চুটকি হাতের আঙুলে আংটি।

বাঙালি হিন্দু বিয়ের রীতি অনুসারে সম্প্রদায়ের সময় কন্যাকে অষ্টাঙ্গে গয়নায় সাজাতে হয়। সেই গয়না জোগাড় করতে বহু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারই যে কী দশা হয়েছে বা এখনও হয় তা বহুবার আমরা শুনেছি, দেখেছি ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পড়েছি। বিভিন্ন সময়ের বিয়ের উৎসবে বিভিন্ন ধরনের গয়নার আধিপত্য দেখা যায়। যেমন তাদের বাহারি নকশা আবার তেমন বাহারি নাম।

'সোনা' কথাটি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন কাহিনীর সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। অতি পরিচিত মহাকাব্য রামায়ণের ঘটনায় পাই— সীতাহরণের ক্ষেত্রে মারীচের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন রাবণ। মারীচ সোনার হরিণের রূপ ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণের কুটিরের কাছে গিয়ে সীতাকে প্রলুব্ধ করলেন। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' বলছেন :

"মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচর।
বিচিত্র সুচিত্র তার স্বর্ণকলেবর।।"

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র 'লোহার বিস্কুট' গল্পে এক অপরাধী সিগারেট খাপের মতো দেখতে পাতলা লোহার মোড়কের মধ্যে সোনার বিস্কুট পুরে মোড়কগুলোকে ট্যাঙ্কের জলের ভেতর রেখে দিত। দরকার মতো দড়ির আগায় চুম্বক বেঁধে ট্যাঙ্ক থেকে মোড়কগুলো তুলত। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে 'সোনা' ধাতুটির কত রমরমা।

আজও গয়না নারীর অঙ্গভূষণ জড়ানো। স্ত্রীধন হিসেবে গয়নাকে ভাবা গেলেও মেয়েদের কাছে গয়না কখনওই শুধু গিনি বা বিস্কুটে সীমিত নয়। তাদের কাছে অলঙ্কার ব্যাপারটা বেশী জনপ্রিয়। এখনকার মেয়েদের কাছে সোনার কানের চেয়ে ঝুমকো কপিপাশা হয়তো বেশি প্রিয় আবার টাই নেকলেশ হয়তো সীতাহারের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। নকশা যাই হোক্ না কেন মেয়েরা আজন্মকাল গয়নায় নিজেদের সাজাতে চায়। নকশার রকমফের রয়েছে, সোনার জায়গায় এসেছে আরও অন্য ধাতু। সালংকরা নারীও আজ হয়তো দেখা যায় না। কিন্তু ম্যাচিং করা গয়নায় আজও নারী গয়নার গাছ। সোনার সঙ্গে আজও নারীর টান। কিন্তু সোনা বর্তমানে অধরা।

বালুচিস্তান কি পূর্ব পাকিস্তানের পথে?

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

ভারত-পাক সীমান্তে চলেছে যে উত্তেজনা তার মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা খুব শিগগির পাকিস্তানকে আবার বিভাজিত করতে পারে। পাকিস্তান সরকার বালুচিস্তানের রাজ্য সরকারকে ভেঙে দিয়ে সেখানে 'রাজ্যপালের শাসন' চালু করেছে। কদিন আগে ১২০ জন শিয়া মুসলমানকে হত্যার ঘটনার পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যপালকে এমন ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে তিনি যখনই প্রয়োজন বুঝবেন ফৌজি শাসনের কথা ঘোষণা করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরফ বলতে চান বালুচিস্তানের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। সেখানকার সমস্যা কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানের দম আটকে দিচ্ছে। বালুচবাসী এখন মরণপণ লড়াই করার জন্যে কোমর বেঁধেছে। পাকিস্তানে এখন সংকট কালের মতো হাল। এরকম অবস্থায় একটা প্রশ্ন দ্রুত উঠে আসছে পাকিস্তানে কি আবার ১৯৭১-এর পুনরাবর্তন ঘটতে চলেছে? ১৯৭১-এ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল তাই-ই ঘটবে না তো বালুচিস্তানে? ভারতের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু ইয়াইয়া খান আর জুলফিকার আলি ভুট্টো কোনও কথাই শোনেননি। যার ফলে ভারত ঢাকায় আক্রমণ চালিয়ে তৎকালীন সরকারকে অপরাধীর কাঠগড়ায় তোলে। ইসলামাবাদের দুঃখ হয়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের সহায়তায় একটা নতুন দেশ গড়ছে দেখে। পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছিল তাই-ই ঘটবে না তো বালুচিস্তানে? কারণ পাকিস্তানে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর যেভাবে অত্যাচার চলেছে তাতে সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন পুরোপুরি বিপন্ন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ এক সাধারণ ঘটনা। এখন তো পাকিস্তানে শিয়াদের থাকাই কঠিন হয়ে গেছে।

শিয়াদের ইমামবাড়িগুলো ক্রমাগত আক্রমণ করছে সুন্নি মুসলমানরা। এই সময়

মরণপণ লড়াইয়ে বালুচরা। (ফাইল চিত্র)

পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশই শিয়া। কিন্তু রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে অনেক শিয়া পাকিস্তান ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করছে। অনেক অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করে সব স্থানীয় শিয়ারা হাতিয়ার তুলে নিয়েছে। এখন তারা সব জায়গায় সুন্নিদের আক্রমণ মোকাবিলা করছে। করাচি, সিন্ধু, হায়দরাবাদ, মীরপুর আর সক্করে শিয়াদের সংখ্যা ভালো। বালুচিস্তানেও সংখ্যা কম নয়। তবে কিছুকাল ধরে বালুচিস্তানের শিয়াদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। সুন্নি মুসলমানরা তাদের মুসলমান বলে স্বীকার করতে নারাজ। তাদের বিরুদ্ধে নানারকম ফতোয়া জারি ও আক্রমণ চলেছে ক্রমাগত। কিছুদিন আগে দু'পক্ষের লড়াইয়ে ১২০ জন শিয়াকে হত্যা করেছে সুন্নিরা।

গোয়াদর-এ শ্যেনদৃষ্টি

পাঠকদের জানিয়ে দিচ্ছি, আয়তনের দিক থেকে বালুচিস্তান পাকিস্তানের সব থেকে বড় রাজ্য। তবে তার জনসংখ্যা সব থেকে কম। তাদের ওখানে জনজাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। ভাষা ফারসি। কারণ এটাই— বালুচীবাসীর বড় অংশ ইরানের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বালুচিস্তানের অনেকের ইরানের সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে বসবাস। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনদের কাছে এটা আশঙ্কার ব্যাপার হয়ে উঠেছে— বালুচিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ইরান যে কোনও সময়ে দখল করতে পারে। সাংস্কৃতিক বন্ধন থাকায় পাকিস্তানের সুন্নি মুসলমানরা এটাকে বিপজ্জনক মনে করছে। ২০০৬ থেকে এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে, ইরান যে কোনও সময় বালুচিস্তান আক্রমণ করে নিজের দেশে মেলাতে পারে। এইজন্যে একটু -আধটু লড়াই হলেই পাক-ফৌজ সতর্ক হয়ে যায়। বালুচিস্তান আর ইরানের সংস্কৃতিও আর ভাষার সম্পর্ককে পাকিস্তান বড়রকম বিপদের সম্ভাবনা বলে মনে করছে। করাচি বন্দরের পাশে রয়েছে বালুচিস্তানের দক্ষিণে গোয়াদর বন্দর। এই বন্দরে আমেরিকা আর রাশিয়া দু'দেশেরই নজর আছে। রাশিয়া যখন মহাশক্তিমান ছিল এখন এই বন্দর দখল করার তীব্র ইচ্ছা তাদের ছিল। কারণ নিজেদের ছয় মুসলমান রাজ্য পেরিয়ে এটা

হোত প্রথম সমুদ্র-দ্বার। আফগানিস্তানের সঙ্গে এই বন্দর দখল হলে লাভ হোত যথেষ্ট। আফগানিস্তান দখলের পিছনে আমেরিকারও ওইরকম উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্যই পাকিস্তান কোনওভাবেই চায়নি ওই বন্দর কোনও দেশের দখলে যাক। ভবিষ্যতে আবার পাকিস্তানে যখন শান্তি ফিরে আসবে তখন আমেরিকা এই বন্দর দিয়ে খনিজ সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে পারে। এই কারণে বালুচিস্তানের সমুদ্রতটের উপর পৃথিবীর মহাশক্তিধরদের নজর রয়েছে।

ইরান আর আমেরিকা

পাঠকদের এই তথ্য ভালোমতো জানা রয়েছে এখন ইরান আর আমেরিকার সম্পর্ক ভালো নয়। ইজরায়েল কোনও ভাবেই চায় না ইরান পরমাণু শক্তিধর হোক। ইরান নিজেদের পরমাণু বোমায় ইজরায়েলকে আতঙ্কিত করে। যদি এখন বালুচিস্তান ইরানের দখলে চলে যায় তবে আরও সংকট তৈরি হবে। সত্যি কথা এটাই— ইসলামি দেশ আর পশ্চিমী গোষ্ঠী দু'পক্ষেরই নজর এই বন্দরের উপর। এরকম অবস্থায় আমেরিকা কীভাবে বালুচিস্তানকে ছেড়ে চলে যেতে চাইবে? ইরান পুরোপুরি শিয়া সম্প্রদায়ের দেশ। শুধু তাই নয় তা একক শিয়া দেশ। এজন্য যখন শিয়া সুন্নিতে সংঘাত বাধে তখন বালুচিস্তানের থাকে বিশেষ ভূমিকা। এখানে ফারসী সংস্কৃতির প্রভাব থাকায় ইরান বড় শক্তি পায়। পাকিস্তান সুন্নিদেশ, এজন্য সমস্ত আরব দেশ একজোট হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধস্থল তৈরি করবে বালুচিস্তানকে। আর এজন্যেই ইরান আর পাকিস্তানের শিয়ারা এই ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগের জন্যে বালুচিস্তানকে ছাড়তে নারাজ। সংক্ষেপে বলা যায়, রাশিয়া আমেরিকা অথবা শিয়া সুন্নিরা নিজেদের শক্তিকেন্দ্র হিসেবে বালুচিস্তানকে নিজেদের দখলে রাখতে চাইবে। আজ এরকম অবস্থায় বালুচিস্তানের শিয়ারা ইরানের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান-বিরোধী হয়ে নিজেদের শক্তি বাড়াতে তৎপর। ২০১৪ সালে আমেরিকা যখন আফগানিস্তান থেকে সরে যাবে তখন দেখা দেবে প্রশ্ন— এশিয়ার এই অঞ্চলে কাদের দাপট বাড়বে। আমেরিকার সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিশ্বাস, পাকিস্তান এক্ষেত্রে বুঝেশুনে এগোবে। এর থেকেও বড় প্রশ্ন, যদি পাকিস্তানই ভেঙে যায় তাহলে বড় সমীকরণ কি হতে পারে? বিশ্বের নামী রাজনৈতিক-বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই সময় পাকিস্তান শুধু পাঞ্জাবে সীমিত থাকবে। সিন্ধু আলাদা অস্তিত্ব জানিয়ে ভারতের অংশ হতে চাইবে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর সমেত উত্তর অংশের দখলদারি চাইবে চীন। সেজন্যেই বিশ্বের শক্তিধররা চাইছে বালুচিস্তানকে আলাদা দেশ হিসেবে রাখতে। ইরান সবসময় সংস্কৃতি আর আত্মিক বন্ধনে সব অবস্থায় বালুচিস্তানকে নিজের দেশের সঙ্গে যুক্ত রাখার চেষ্টা চালাবে। দেশের এই অংশকে ধারাবাহিকভাবে অবহেলা করেছে পাকিস্তান, আজ তার দরুন দেখা দিয়েছে গভীর সংকট। আজ অনেক মাশুল দেওয়ার সময় এসে গেছে।

অন্যায়ের তালিকা

বালুচিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে যা যা অন্যায় করেছে তার তালিকা দীর্ঘ। পাকিস্তানের এক সময়ের সেনাপ্রধান টিক্কা খাঁ যথেচ্ছ হত্যা করেছে বালুচবাসীদের। আজও সেখানকার মানুষ তাকে 'বালুচবাসীর কসাই' বলে মনে রেখেছে। বালুচীদের অপহরণ করা তো সাধারণ ঘটনা। গত ৩৮ বছর ধরে যে হত্যালীলা চলছে সে সম্বন্ধে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত সতর্কবাণী শুনিয়েছে। আদালত এও বলেছে, পাক সরকার সেইসব নেতাদের কথা জানাক যাদের জন্যে ওইসব মানুষ নিরুদ্দেশ। বালুচিস্তানের নেতারা এজন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘে অভিযোগ জানিয়েছেন। মানব-অধিকার সংগঠনের এক প্রতিনিধিকে পাঠানো হয় কোয়েটায় পরিস্থিতি যাচাই করার জন্যে। মীর হজারা খান বজরানী যোগাযোগ রাখে রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে— এই অভিযোগ পাকিস্তান করে থাকে। পাকিস্তানের আই এস আই তার উপর নজর রাখছে। রাষ্ট্রবাদী সংগ্রামীরা জনগণকে সতর্ক করেছে সরকারি লোকজন থেকে সাবধান হওয়ার জন্যে। রাষ্ট্রবাদীরা 'বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি' গঠন করেছে। সরদার আতাউল্লার নেতৃত্বে লন্ডনে কিছুকাল আগে এক বৈঠক হয়েছিল যেখানে মুজাহির কৌমী মুভমেন্ট নেতা আলতাফ হুসেন, ফরখতুন মিল্লি, মহম্মদ খান ও সিন্ধি নেতা সৈয়দ ইমদাদ শাহ উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রভাগ নিয়ে আলোচনা করেন নেতারা। পাকিস্তানের নিন্দা করেন। পাকিস্তানের বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। বিপর্যস্ত পাকিস্তানকে শান্তি পাঠ করানোর জন্যে ভারতের কাছে এটাই সঠিক সময়।

সৌজন্য : পাঞ্চজন্য ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান— ১৩ জানুয়ারি,
২৭ জানুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি,
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩

ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪, ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

গুজরাটের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ

তারক সাহা

প্রকল্পের নাম জে এন এন ইউ আর এম বা জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে বিতরণযোগ্য অর্থের পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগের বিষয়ে কেন্দ্র দ্বিধান্বিত। শতাংশ খরচ করেছে। বাকি রাজ্যগুলি গুজরাটের পিছনে। ২০০৫-২০১২ সাল অবধি এই প্রকল্পের উপযোগিতা কেন্দ্রকে দ্বিধায় ফেলেছে। সামনে ২০১৪, নির্বাচনের রণদামামা ইতিমধ্যে বাজতে শুরু করেছে। তাই কেন্দ্র ভাবছে এখন কীভাবে এই বিপুল অর্থকে ব্যবহার করা যায়। মহারাষ্ট্রে ইউ পি এ শক্তিশালী আর কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক অন্য যেখানে অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ৮০ আর প্রকল্প শেষ হয়েছে ২০টি, সেখানে গুজরাট ৭১টি অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে ৪২টি প্রকল্প শেষ হয়েছে। অথচ জনসংখ্যার ভিত্তিতে যদি অর্থের বিনিয়োগ ঘটে তবে গুজরাটের স্থান ষষ্ঠে চলে যায়।

২০০৪ সালকে সামনে রেখে সরকার এই বিপুল অর্থের আবন্টন নীতি পাল্টাচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকার এই অর্থ খাদ্যসুরক্ষা আর সার্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে চাইছে। এই দুই প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্র কৌশলে গুজরাটকে বঞ্চিত করতে চাইছে। এর কারণ স্পষ্ট এবং তা হলো অর্থনীতির দিক থেকে গুজরাট দেশের পয়লা নম্বর রাজ্য। আর সেখানকার আমজনতার আর্থিক হাল দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশ কয়েক কদম আগে। সুতরাং এই দুই প্রকল্পে রাজ্যের চাহিদা অন্য রাজ্যের তুলনায় কম। খাদ্য আর স্বাস্থ্য এমন দুই সংবেদনশীল ক্ষেত্র যেখানে বিনিয়োগের কথা বললে তেমন একটা সমালোচনা হবে না। আবার যেসব রাজ্যে কংগ্রেস দুর্বল, সেখানে গরীবদের মধ্যে খাদ্যসুরক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ালে আম-আদমির সমর্থন মিলতে পারে শত সহস্র অপকর্মের মধ্যেও। অন্যদিকে গুজরাট এমন এক রাজ্য যেখানে সম্প্রতি মোদী প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন। তাই সেই রাজ্যে ২০১৪-তে ভাল ফলের আশা কংগ্রেসের পক্ষে সুদূর পরাহত। বরং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে টাকা না দিয়ে পরোক্ষে মোদীকে প্যাঁচে ফেলার ছক খুঁজছে কংগ্রেস।

যেহেতু প্রকল্পটি যুক্ত নগর উন্নয়নের

কারণ ''গুজরাট ফ্যাক্টর'' কেন্দ্রীয় সরকারকে বিচলিত করেছে। কারণ হলো বিভিন্ন রাজ্য যখন সরকারি অনুদান খরচ করতে না পারায় ফেরত চলে যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যে ব্যাপারটা তখন অন্যরকম। সেখানে ওই প্রকল্পের বিতরিত অর্থে ৭১টি পরিকল্পিত প্রোজেক্টের ৪২টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ। অর্থাৎ অনুমোদিত অর্থের ৮১ শতাংশ অর্থ পুরোপুরি ব্যয় হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যের সামনে রয়েছে একমাত্র রাজ্য মহারাষ্ট্র— যে রাজ্য অনুমোদিত অর্থের ৯২ রাজ্যের তুলনায় ভাল। সেখানে তাদের দোসর এন সি পি। তাই গুজরাটের ফলাফল ভাল হলেও যেহেতু গুজরাটে ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোদী তাই একটা অস্থায়ীভাবে অর্থের বিনিয়োগ চাইছে কেন্দ্র। প্রকল্পভিত্তিক বিনিয়োগ না করে কেন্দ্র চাইছে এই অর্থ বিনিয়োগ হোক নগরভিত্তিক জনসংখ্যাকে ভিত্তি করে। আর এতেই জিত মহারাষ্ট্রের। গুজরাট এই দৌড়ে ষষ্ঠ স্থানে। সরকার তাই গুজরাটের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নেমেছে। গুজরাট সরকারের দাবি মহারাষ্ট্রে

সঙ্গে, সেহেতু অর্থ বরাদ্দের দায়িত্বে কেন্দ্রের নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের। এতদিন দুটি মাপকাঠিতে নগর উন্নয়ন মন্ত্রক অর্থ বরাদ্দ করত। প্রথম পর্যায়ে মাপকাঠি ছিল জনসংখ্যা সংস্কারের ওপর। বাকি ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার ওপর।

এই সূত্র অনুসারে কিন্তু এই অর্থের বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওয়ার কথা গুজরাটের। কারণ সেখানেই দ্রুত প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়েছে বা হচ্ছে। গুজরাটের এই ব্যাপক সাফল্য অর্থ বরাদ্দ করায় কংগ্রেসকে চিন্তায় ফেলেছে। অন্য রাজ্যগুলি যখন প্রকল্প রূপায়ণে যথেষ্ট পিছিয়ে, সেখানে অগ্রণী হয়ে গুজরাট চালু প্রকল্পগুলিতে বা নয়া প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগে কেন্দ্রের অনীহার একমাত্র কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। যে দেশে ক্ষমতা দখলই রাজনৈতিক দলগুলির একমাত্র ভাবনা-চিন্তা সেখানে অবশ্য এ নিয়ে ভাবলেই বা কী এসে যায়!

গুজরাটের সঙ্গে তুলনায় কংগ্রেস শাসিত অন্যান্য রাজ্যগুলির উন্নয়নে ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে। (সারণী দ্রষ্টব্য) রিপোর্ট কার্ড চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অন্ধ্র ও রাজস্থান দুই কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে যথাক্রমে ৫২ ও ১৩টি পরিকল্পিত প্রোজেক্টের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে যথাক্রমে ৪২ ও ৪টি প্রোজেক্ট। এই রিপোর্ট কার্ড অবশ্যই কংগ্রেস কর্তাদের লজ্জায় ফেলবে। সুশাসন না দিতে পারলেও কৌশলে সতত চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রের সরকার। কংগ্রেসের এই বিমাতৃসুলভ বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব গুজরাট।

সারণী

রিপোর্ট কার্ড

রাজ্য	পরিকল্পিত প্রোজেক্ট	সম্পূর্ণকৃত প্রোজেক্ট	বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার (শতাংশ)
মহারাষ্ট্র	৮০	২০	৯২
পশ্চিমবঙ্গ	৬৯	১৯	৪৩
অন্ধ্র	৫২	২০	৬৩
গুজরাট	৭১	৪২	৮১
রাজস্থান	১৩	৪	৬৯

আর রাজ্যের অর্থ ব্যবহারের ভিত্তিতে। প্রথম ক্ষেত্রে গুজরাট ষষ্ঠ স্থানে রইলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হোত প্রকল্প রূপায়ণের ওপর এবং ২৫ শতাংশ প্রশাসনিক

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধীদের অব্যাহতির চেষ্টা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল কাদের মোল্লা সহ একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধীর শাস্তি ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একাত্তরের ঘাতকদল নির্মূল কমিটির কার্যকরী সভাপতি এবং যুদ্ধ অপরাধ সক্রান্ত গবেষক শাহরিয়া কবির টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধীদের অব্যাহতি দেওয়ার চেষ্টা বাংলাদেশে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের প্রসার ঘটিয়েছে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী জবরদখল বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা কী নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল তা সকলেই কমবেশি জানেন। সেই অত্যাচারের বলি হয়েছিল ৩০ লক্ষ মানুষ। ২ লক্ষেরও বেশি মহিলা ধর্ষিতা হয়েছিলেন। দু' কোটি মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এছাড়া ১ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী এমন ব্যাপক নরসংহার কখনও দেখেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর মুজিবর রহমান সরকার যুদ্ধ অপরাধী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা এতে দমে যাননি— নিজেদের মতো করে ন্যায় বিচারের দাবীতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের দীর্ঘদিনের এই প্রচেষ্টা এবং সেইসঙ্গে নাগরিক সমাজের নজিরবিহীন অভিযানে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার শুরু হয়। কোনও ট্রাইব্যুনাল আইনে যুদ্ধ অপরাধের শুনানির জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করা হয়নি। একাত্তরের আক্রমণকারীদের যারা শিকার হয়েছিলেন তাদের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার জন্য এই দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার খুব প্রয়োজন ছিল।

জামাত-ই-ইসলামি একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল। নির্মমভাবে বাংলাদেশের মানুষকে গণহত্যার জন্য জামাত পাকিস্তানী সামরিক দখলকারীদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। ন্যুরেনবার্গ শুনানীতেও নাৎসী পার্টি সহ সাতটি দলকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছিল। একইরকমভাবে জামাত-ই-ইসলামিকে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাওয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না। বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে গঠিত এবং সেখানে ধর্মমতকে ব্যবহার করে গণহত্যা চলবে না।

বাংলাদেশের এই শুনানি আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁদের উদ্দেশে শ্রী কবীরের প্রশ্ন হলো— কিভাবে আন্তর্জাতিক মানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যাবে? বস্তুত এই একই প্রশ্ন নাৎসী যুদ্ধ অপরাধীদের ন্যুরেনবার্গ শুনানির সময়ও উঠেছিল। ঘটনা হলো, যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বিজয়ীরাই করে থাকে।

২০০২-এ আন্তর্জাতিক অপরাধী আদালত বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যারা পুরনো ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করে দেখেননি। ফলে কোনও শুনানীও হয়নি। বাংলাদেশ কিন্তু গণহত্যাকারীদের বিচারের জন্য অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেছে। রোয়ান্ডা (Rwanda) ও আগেকার যুগোশ্লেভিয়ার মতো দেশগুলির কাছে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে একটা উদাহরণ স্থাপন করেছে।

> "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী জবরদখল বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা কী নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল তা সকলেই কমবেশি জানেন। সেই অত্যাচারের বলি হয়েছিল ৩০ লক্ষ মানুষ। ২ লক্ষেরও বেশি মহিলা ধর্ষিতা হয়েছিলেন। দু' কোটি মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এছাড়া ১ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী এমন ব্যাপক নরসংহার কখনও দেখেনি।"
>
> *— শাহরিয়া কবির*

কিছু কি শিক্ষা নিতে পারছেন জনাব?

সঞ্জীব বাগচী

ভারী দুঃখ লাগল খবরের কাগজে দেখে যে জেলের গরাদ ধরে আপনি বলেছেন 'দলই শেষ করে দিল।' আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি পশ্চিমবঙ্গের আমজনতার মধ্যেকার অতিক্ষুদ্র এক সাধারণ মানুষ। আমি সেই আমজনতা যারা প্রতিশ্রুতির লোভে, শান্তির আশায় আপনাদেরকে ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় আনে। তারপর তারা যূপকাষ্ঠে নীরবে বলি হয়ে যায়। আমরা আপনাদের মিথ্যা আশ্বাস বুকে নিয়ে বাঁচার আশায় থাকি। ক্রমশঃ দারিদ্র্যে অনাহারে শেষ হয়ে যাই। একটা সরকারী চাকরির কয়েক হাজার পোস্টের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি কয়েক লক্ষ লোক। আঁচড়া-আঁচড়ি করি, কামড়া-কামড়ি করি আর সেই ফাঁক তালে আপনারা ক্ষমতাবানরা সুযোগ দেন, পাইয়ে দেন কিছু মানুষকে যারা আপনাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দেয় বা তোষামুদি করেন। সেই আপনি বলছেন দলই শেষ করে দিল। আসলে ভারতীয় গণতন্ত্রের নিয়মই এই— দলই ক্ষমতা দেয়। দলই সুযোগ নেয়। দলই মাথায় তোলে আবার কাজ ফুরোলে মাটির ভাঁড়ের মতো ফেলে দেয়। এ শুধু আপনার দল নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত দলের ধর্মই এই। আপনারও আগে আরও অনেকেই এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। আসলে দলই আপনাদের শেখায় আইন ভাঙতে। না হলে নাকি জনসমাজে সম্মান পাওয়া যায় না। দলের ক্যারিশমা বাড়ে না। দু-একটা খুন, জমি দখল, অর্থ-রোজগার অবশ্যই বাঁ-হাতি। পার্টিফান্ডে টাকা তুলে দিতে পারলে আপনি তো দলের সম্পদ। পার্টি একবারও বিচার করবেই না অতগুলো টাকা আপনি কোথা থেকে দিলেন। এই চোখটুকু ঢেকে না রাখলে যে দল চলে না। সবইতো আজকাল পাওয়ার গেম— জানেনইতো। আবার একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে একথাও আপনার মনে রাখতে হয় দলের ভেতরে গ্রুপবাজীর ব্যাপারটা। আসলে দলের আর দোষ কি বলুন, দল তো আপনার আমার মতো লোকদের নিয়েই তৈরি হয় যাদের মধ্যে স্বার্থপরতা আছে, ক্ষমতার লোভ আছে, ক্ষমতা দখলের জন্য জোর খাটানোর শক্তি আছে— দরকারে মারধোর, খুন, জখম, অগ্নি প্রজ্জ্বলন করবার মতো মনের জোরও রাখতে হয়। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারই প্রকৃত দলের সৈনিকের ধর্ম। আর সেখানে আপনি যথেষ্ট সফল। আর যেখানে এত হারামজাদা সংবাদমাধ্যম, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ, বিরোধীদের আন্দোলনের চাপে আপনার দল রাজধর্ম পালন করল তাতে দলের দোষ দিয়ে কি হবে। অতীতে আপনাদের পূর্ববর্তী সরকারেও এ নজির আমরা অনেক দেখেছি, দমদমের দুলাল, সল্টলেক স্টেডিয়ামের হাত কাটা দিলীপ, ক্যাওড়াতলার স্বপন, শ্রীধর—প্রথমে তাদের জয়গান। তাদের পাশে দাঁড়ানো। পরেই পাল্টি খেয়ে নিজেদেরকে সমস্ত দুষ্কৃতিমুক্ত সাধু সাজানোর চেষ্টা। কিংবা ছত্রধর মহাতোর কথাটাই ধরুন। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন ভারতবর্ষটাই গদ্দারের দেশ— উপকারীর মর্যাদা দিতে জানে না। আপনি তো প্রশ্ন করতেই পারেন, গ্রেফতার তো আমায় বৈদিক ভিলেজকাণ্ডেই করতে পারতিস, কিংবা যখন অধ্যাপিকার কপালে জগ ছুঁড়ে মারলাম তখনই তো— তা না, যখন হাজি রেজ্জাককে মারলাম কি এমন বেশি দোষ হলো! ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র সব ষড়যন্ত্র। আপনার নিশ্চয় এটাও মনে হচ্ছে, বিরোধীদের সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়েছে আপনার দল। যেমন আমরা আগেও দেখেছি হাতে হাত মিলিয়ে প্রশ্রয় দিয়েছে। অবশ্য এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আপনারা এবং তথাকথিত বামপন্থীরাতো মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। মিথ্যাচার, জুলুমবাজী, মস্তানি করে ক্ষমতাকে ধরে রাখতে চান আপনাদের নেতারা। অবশ্য আপনাদের পূর্বসূরী কংগ্রেসী দাদারাও সেই এক। কিন্তু দেখুন তো ভারতীয় জনতাপার্টির দিকে। দেখুন গুজরাটকে, বিহারকে। মনে করুন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে থাকা এন ডি এ জোটকে। কই সেই জোটকে তো সিবিআই জুজুর ভয় দেখিয়ে টেকাতে হয়নি— মস্তানি করতে হয়নি। আসলে কি জানেন জন্মলগ্নেই যার গ্রহের দোষ হয় সে তো মস্তান দিয়ে গুণ্ডা দিয়ে ক্ষমতা রাখবে— ভালোবাসা দিয়ে নয়। প্রয়োজন ফুরালে মুখ ফিরিয়ে নিতে দ্বিধা করবে না। এর থেকে কি কিছু শিক্ষা নিতে পারছেন জনাব। অশনি সঙ্কেত কিন্তু সামনে আকাশে। আপনারা যাঁরা নীতি আদর্শ ভুলে ক্ষমতা হাতে রাখতে চান তাঁরা পড়তে পারছেন কি? আর কি বলব? আপনাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক। দেশপ্রেমের জন্ম হোক— এই কামনা করে শেষ করলাম।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

অন্য রকম

ক্লাসরুমে রেডিও জকি, আনন্দে মুখর পড়ুয়ারা

বিরাজ রায়॥ ব্যাগ ভর্তি বইয়ের বোঝা, ব্ল্যাকবোর্ডে চকের আঁকিবুকি— আর ভালো লাগে না। তাই পড়ুয়াদের মন ভরাতে ক্লাস নিচ্ছে রেডিও জকি। তবে ক্লাসে এসে নয়, রেডিওর মাধ্যমে। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এমনই অভিনব পদ্ধতিতে ক্লাসে পড়ানো চালু করলো পাঞ্জাবের রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ। ইতিমধ্যেই তা শুরুও করে দিয়েছে মহালী জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা। এতে ফাঁকিবাজ পড়ুয়ারা তো বটেই, খুশি সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরাও। জেলার এক শিক্ষক হরজিৎ কুমার জানিয়েছেন— ‘রেডিও ক্লাস তো একটা গ্রুপ পিকনিকের মতো। ছাত্রছাত্রীরা যেমন আনন্দ পাচ্ছে তেমনি তাদের পড়াকেও সহজ করে দিয়েছে। আর পুরানো পড়াকে ঝালিয়ে নেওয়ারও এটা একটা নতুন পথ।’

রাজ্যের স্কুল শিক্ষা পর্ষদ এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও-র যৌথ উদ্যোগে গত ২০ ডিসেম্বর রেডিও-তে সূচনা হয় ‘শুনো শোনাও’ নামে এই বিশেষ অধিবেশনের। প্রতি মাসের প্রায় কুড়িদিন চলে এই রেডিও ক্লাস। রুটিন মাফিক সব ক্লাস শেষ হলে শুরু হচ্ছে এই অধিবেশন। আর তখনই সমস্ত স্কুলের পড়ুয়ারা প্রবল আগ্রহ নিয়ে হাজির হচ্ছে রেডিও সেটের পাশে। প্রতিদিন এই রেডিও ক্লাসে অংশ নিচ্ছে প্রায় বারো লাখ প্রাথমিক স্কুল ছাত্রছাত্রী। কুড়ি মিনিট মুগ্ধ হয়ে শুনছে ক্লাসের সব আলোচনা। আর রেডিওতে আলোচনার বিষয়বস্তুও নির্ধারণ করা হচ্ছে সিলেবাস অনুযায়ীই। ক্লাসের প্রথম দিনের অধিবেশনে পরিবেশিত হয়েছে মহাকাশচারী কল্পনা চাওলাকে নিয়ে একটি আলোচনা। বর্ণনা করা হয়েছে এই মহিলা মহাকাশচারীর জীবন, কর্ম এবং তার স্বপ্নকে বাস্তব করতে অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। প্রথম দিনের ক্লাসেই সবার মন জয় করে নিয়েছে রেডিও জকি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে গেছে এবিষয়ে আরও পড়ার। তবে আনন্দটা শুধু পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষকরাও চাইছে ক্লাস নেওয়ার এই নতুন পদ্ধতিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে।

স্কুল শিক্ষা পর্ষদের জেনারেল ডিরেক্টর কাহন সিং পানু জানিয়েছেন— ‘বাছাই করা বিষয় নিয়ে এই ক্লাস পড়ুয়াদেরকে ধারাবাহিক রুটিনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেবে।’ গল্প, কবিতা, ব্যঙ্গাত্মক শ্রুতি নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা পাঠ্য বিষয় ছাত্ররা সহজেই তো গ্রহণ করতে পারছে। কোনও কঠিন বিষয়ও পড়ুয়াদের সহজেই বোধগম্য হচ্ছে বলে শিক্ষকরাও মনে করছেন। রায়পুরের ক্লাস ফাইভের ছাত্র হরজিৎ কর জানিয়েছে— ‘একেকটি অধ্যায় আয়ত্ত করতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হোত। সেটা অনেকটা কমে গেছে।’ একই মত তারই বন্ধু মনোজিৎ কুবের। সে জানিয়েছে— ‘আমরা এখন কারও সাহায্য ছাড়াই পাস করতে পারছি।’ মোট কথা রেডিও জকির রেডিও ক্লাস যে পাঞ্জাবের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে উৎসাহের সঞ্চার করেছে তা বলাই বাহুল্য।

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chilli Powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

মুদ্রার প্রকারভেদ

(২য় পর্ব)

আশীষ পাল

কয়েকটি মুদ্রা ও তার ফল

সূর্য মুদ্রা (Sun Mudra) :

সূর্য মুদ্রা

অনামিকা আঙ্গুলটিকে বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ায় লাগিয়ে হাল্কা চাপ দিন, তা হলেই সূর্য মুদ্রা হবে। আর অন্য তিন আঙ্গুল সোজা রাখবেন। বজ্রাসন/সুখাসনে বসে এই মুদ্রা করা উচিত। সতর্কতা— এই মুদ্রা বেশি সময় ধরে করা উচিত নয়। কেবল ১৫ মিনিট এর বেশি নয়। দুর্বল কমজোরী, ব্যক্তি না করলে ভাল হয়। গরমের দিনে এই মুদ্রা বেশিক্ষণ করতে যাবেন না। যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তারা খুব কম সময় করবেন বা যোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে করা উচিত।

উপকারিতা : এই মুদ্রায় শরীর সঞ্চালিত হয়। ওজন কমে, শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। নেত্রজ্যোতি বাড়ে। টেনশন দূর হয়। কোলেস্ট্রোরলের মাত্রা কম হয়। ডায়াবেটিজ ও লিভারের দোষ দূর করে। এছাড়া থাইরয়েড গ্রন্থি সুস্থ সবল হয়।

বরুণ মুদ্রা (Water Mudra) :

বরুণ মুদ্রা

কনিষ্ঠা আঙ্গুল অর্থাৎ কড়ে আঙ্গুলটিকে বুড়ো আঙ্গুলের ডগা স্পর্শ করলে বরুণ মুদ্রা হবে। অন্য তিন আঙ্গুল সোজা থাকবে। সতর্কতা— কফ প্রকৃতির ব্যক্তিদের এই মুদ্রা বেশি করা উচিত নয়।

উপকারিতা : এই মুদ্রা অভ্যাস করলে দেহে জলের অভাবজনিত কারণে খিঁচুনি ও অন্যান্য জলাভাবজনিত রোগ দূর হয়। শরীরের রক্ষতা ভাব নষ্ট হয় এবং শরীরের ত্বক মোলায়েম হয়, চর্মরোগ, রক্ত বিকার, ব্রণ এমনকী এই মুদ্রা করলে মহিলাদের মুখশ্রীকে সুন্দর করে তোলে।

জলোদর মুদ্রা (Ascitis Mudra) :

কড়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ বুড়ো আঙ্গুলের মূলে লাগিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কড়ে আঙ্গুলকে চাপ দিলে জলোদর মুদ্রা হবে। অন্য তিনটি আঙ্গুল সোজা থাকবে।

জলোদর মুদ্রা

উপকারিতা : নাক দিয়ে জল পড়া, চোখে জল পড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভালো। যাদের পেটে জল জমে তাদের ক্ষেত্রে ভালো ফলদায়ী।

প্রাণী মুদ্রা (Life Force Mudra) :

কনিষ্ঠা আর অনামিকা আঙ্গুলের অগ্রভাগ এর সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগ মিলালে বা স্পর্শ করলে প্রাণ মুদ্রা হবে, আর অন্য দুই আঙ্গুল সোজা থাকবে।

প্রাণী মুদ্রা

উপকারিতা : এই মুদ্রা অভ্যাসে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। স্নায়ুবিক ক্লান্তি দূর হয়, রক্ত সঞ্চালনের গতি বাড়ে। সেই কারণে প্যারালাইসিস রোগীর ক্ষেত্রে এই মুদ্রা খুব ভালো কাজ করে। নেত্রজ্যোতি বাড়ে, এছাড়া ক্ষুধা তৃষ্ণার তীব্রতা দূর করে।

অপান মুদ্রা (Digestion Mudra) :

মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলের অগ্রভাগ বুড়ো আঙ্গুলের অগ্রভাগের সঙ্গে মিলালে বা স্পর্শ করলে অপান মুদ্রা হবে। অন্য দুই আঙ্গুল সোজা থাকবে।

অপান মুদ্রা

উপকারিতা : শরীর নির্মল হয়। নিয়মিত অভ্যাস করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, বায়ু বিকার, ডায়াবেটিজ, কিডনির দোষ, দাঁতের ব্যাথা ইত্যাদি দূর হয়। পেটের জন্য উপযোগী মুদ্রা। যাদের শরীরে ঘাম আসে না তারা নিয়মিত করলে ঘাম আসবে।

সতর্কতা : এই মুদ্রা অভ্যাস করলে মূত্র বেশি পরিমাণে হবে। গর্ভ অবস্থায় না করা।

অপান বায়ু মুদ্রা বা হৃদয় মুদ্রা (Heart Mudra) :

অপান মুদ্রা + বায়ু মুদ্রাকে একসঙ্গে করলে অপান বায়ু মুদ্রা হবে। কনিষ্ঠা অঙ্গুলি সোজা থাকবে। এই মুদ্রার অপর নাম হৃদয় মুদ্রা। অনেকে মৃতসঞ্জীবনী মুদ্রা বলে।

হৃদয় মুদ্রা

উপকারিতা : যে সকল ব্যক্তির হৃদয় দুর্বল, তাদের এই মুদ্রা হৃৎযন্ত্র সবল করে। যাদের হার্ট রোগে আক্রান্ত হয় তারা করলে আরাম পাবেন। পেটের গ্যাস হলে এই মুদ্রা করলে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। মাথাধরা, হাঁপানি এবং উচ্চ রক্তচাপ রোগীর ক্ষেত্রে এই মুদ্রা ফলদায়ী। অ্যাজমা রোগীর সিঁড়িতে উঠতে গেলে খুব অসুবিধা হয় সিঁড়ি ওঠার আগে থেকে করলে ২-৩ মিনিট খুব সহজে তাঁরা সিঁড়িতে উঠতে পারবেন।

(ক্রমশ)

ভারতীয় জুট মজদুর সঙ্ঘের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত ভারতীয় জুট মজদুর সঙ্ঘের (বি জে এম এস) ২০ তম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন গত ২৬-২৭ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার কাঁকিনাড়ার (ভাটপাড়া) 'মৈত্রী লজে' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক বি. সুরেন্দ্রন্, সর্বভারতীয় সম্পাদক কে. পি. সিং, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা প্রদ্যুৎ মৈত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বি. এম. এস-এর কার্যকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চারশ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২৬-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিগণও অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বক্তা পাটশিল্পের ভবিষ্যতের বিষয় সংশয় প্রকাশ করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চরম নিষ্ক্রিয়তার ফলে জুট মিল মালিকদের ব্যাপকভাবে শ্রম আইন উল্লঙ্ঘনের এবং এইজন্য সৃষ্ট চরম অরাজকতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে জুট মিল সমূহে নূতন বেতন চুক্তির দাবী সদন পেশ করা হবে, এজন্য পাটশিল্পের সমস্ত ইউনিয়ন বি এম এস-এর নেতৃত্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি হলো— ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ, গ্র্যাচুইটি, আইন, বেতন পরিসীমা, শ্রম আইন ভঙ্গ, ইপি এফ ইত্যাদি। এছাড়া পাটশিল্পে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

কোচবিহার জেলায় সঙ্ঘের পথসঞ্চলন

গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার জেলার এক সুদৃশ্য পথসঞ্চলন দিনহাটা শহরে হয়ে গেলো। প্রায় দু'শোজন স্বয়ংসেবক গণবেশ পরে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে শহর পরিক্রমা করেন।

সঞ্চলনের পূর্বে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিভাগ-সঙ্ঘচালক সতীশচন্দ্র বর্মন, জেলা-সঙ্ঘচালক ধনমন্ত কার্যী এবং দিনহাটা মহকুমা সঙ্ঘচালক অখিল সরকার। নেতাজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও আদর্শে বিশ্বাসী আর এস এস আজও নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের কাজ করে চলেছেন বলে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ দেবাশীষ লালা তাঁর ভাষণে বলেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পর্ক প্রমুখ উদয়শঙ্কর সরকার, প্রান্ত-সেবাপ্রমুখ অজিত কুমার পাল, প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ উত্তম রায় এবং বিভাগপ্রচারক তথা প্রান্তের সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ গণেশ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ সমাচার

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য সম্মেলন

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের একাদশ রাজ্য সম্মেলন গত ২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি হুগলী জেলার আরামবাগের কাছে বালিবেলা সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো। এই উপলক্ষে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাকর বেলকরী, মোহিনী মোহন মিশ্র এবং কার্যকারিণী সদস্য অজিত কুমার বারিক উপস্থিত ছিলেন। গো-মাতা ও বলরাম পূজার মাধ্যমে কিষাণ সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ সহ-সভাপতি গোপেন বেরা। দীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী ভাষণ দেন আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার।

সম্মেলনে ১৮টি জেলা থেকে ১৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ২২ জন মহিলা প্রতিনিধি। প্রভাকরজী বলেন, সংগঠন গড়তে হলে সংগঠনাত্মক, রচনাত্মক ও আন্দোলনাত্মক কাজকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষকদের বর্তমান জলন্ত সমস্যা ও তার সমাধানের একমাত্র পথ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। কেন্দ্রীয় কৃষি নীতির বিরুদ্ধে ৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে আগামী ১২ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। প্রতি তিন বৎসর পর প্রদেশ সমিতির নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়। এবারও ২৫ জানুয়ারি প্রদেশ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নন্দলাল কাঠ এবং সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কুমার মণ্ডল। কোষাধ্যক্ষ রণজিৎ ঘোষ। সহকোষাধ্যক্ষ শঙ্কর ঘোষ। প্রদেশ সভাপতি মোট ২১ জনের প্রদেশ সমিতি ঘোষণা করেছেন। এই সমিতি আগামী তিন বৎসর সংগঠনের কাজ বৃদ্ধির জন্য

প্রীতিলতা ছাত্রীবাসের বার্ষিক উৎসব

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা ব্লকের বিপ্রদাসপুর গ্রামে অবস্থিত প্রীতিলতা ছাত্রীবাসের বার্ষিক উৎসব গত ২৭ জানুয়ারি সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে সুভাষ সরকার, বিমলকৃষ্ণ বর্মন, খগেন্দ্র প্রসাদ মণ্ডল ও কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক মহাদেব গড়াই।

সংকল্প নিয়েছে।

শ্রীরামপুরে ভারতমাতার পূজা এবং শিল্পমেলা

গত ১৮ থেকে ২৭ জানুয়ারি আগের বছরের মতো হুগলী জেলার শ্রীরামপুর গান্ধী ময়দানে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং সমারোহে ভারতমাতার পূজা ও শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হলো। দশদিন ব্যাপী এই পূজা ও মেলায় সাংস্কৃতিক, সংগীত-অনুষ্ঠান সহ সেবামূলক (সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা) এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইসব আলোচনা সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, ডঃ প্রীতিমাধব রায়, ডঃ বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক তথাগত রায়, বর্তমান বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেন। এবারের মেলায় কয়েকটি সরকারি সংস্থা তাদের বিপন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের আয়োজন করে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। মেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ২৭ জানুয়ারি ক্রীড়া ভারতীর অনুষ্ঠান। শ্রীরামপুরের বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার মূর্তিতে মাল্যদান করে ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি স্বনামধন্য নারায়ন সিং রানা সহ বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক, ক্রীড়া বিচারক। খেলোয়াড়রা শোভাযাত্রা সহকারে গোপীনাথ স্মৃতি কিশোর সংঘের প্রাঙ্গণ থেকে মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত নয়। এই দিন মেলামঞ্চে ক্রীড়া বিষয়ক আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর রাজ্য-সভাপতি তপন মোহন চক্রবর্তী এবং সহ-সভাপতি বিখ্যাত শুটার ক্যাপ্টেন ভগীরথ সামুই। যোগাসন প্রতিযোগিতার স্থানাধীকারীদের পুরস্কার প্রদান করেন শ্রী রানা। ক্যারাটে এবং কিক্ বক্সিং প্রদর্শিত হয়। হুগলী জেলার কিক্ বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল কিক্ বক্সিং (একটি বিশেষ ধরনের মার্শাল আর্ট) জেলার কয়েকটি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে আবশ্যিক শিক্ষণীয় বলে স্বীকৃত। প্রবীণ সমাজসেবী সকলের পরিচিত নাড়ুদা (জয়দেব নাগ), তপন নাগ, ডাঃ পি কে দাশসহ বহু বিশিষ্টজন বিভিন্ন দিন উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তা, অংশগ্রহণকারী, উপস্থিত জনদের উৎসাহিত করেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি অরুণ চক্রবর্তীর অভিভাষণ এবং কবিতা পাঠ। শ্রী চক্রবর্তী রচিত 'লাল পাহাড়ের দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা, তুকে ইখানে মানাইছে না রে' কবিতাটি পরবর্তীকালে বাংলা লোকসংগীতে আর্ন্তজাতিক প্রসিদ্ধি পায়। অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও সাধক ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় (৭২) তাঁর সাবলীল, সতেজ কণ্ঠে অনুপম গায়কীতে রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করেন শ্রোতৃবন্দকে আনন্দযজ্ঞে যুক্ত করে। মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান অমিয় মুখার্জী এবং শেষ দিন চুঁচুড়া-হুগলী লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ রত্না দে (নাগ)।

নবদ্বীপ সংস্কৃত সমাজের বার্ষিকোৎসব

গত ২৭ জানুয়ারি নবদ্বীপে শ্রীশ্রী গৌর-গোপীনাথ মন্দিরে 'নবদ্বীপে সংস্কৃত সমাজ-এর ১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংস্কৃত-অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবদ্বীপ সংস্কৃত সমাজের সভাপতি ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে পণ্ডিত সত্যপদ ভট্টাচার্য ও সমাজসেবী বৃন্দাবনধর গোস্বামী। স্বাগত ভাষণ দেন অরুণ কুমার চক্রবর্তী। এই উৎসবে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের অধীন অনৌপচারিক সংস্কৃত শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাক্তন রাজ্য-সংযোজক বেদান্ত-শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত সত্যপদ ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধাপুষ্প নিবেদন করা হয়। ২০১২ সালের উচ্চমাধ্যমিকে নবদ্বীপের মধ্যে সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত দীপিকা অধিকারীকে মানপত্র সহ পুরস্কৃত করা হয়। শ্রীশ্রী শ্যামবিনোদিনী কুঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সংস্কৃত নাটিকা, নৃত্য, গীত, স্তোত্রাবলী পরিবেশন করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

মেদিনীপুরে ষড়ভুজ সংস্থার নাট্যোৎসব

২৭ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরে শেষ হলো চারদিনব্যাপী নাট্য উৎসব। ষড়ভুজ

নাট্যসংস্থার এই লোক-আঙ্গিকের প্রযোজনা আগত দর্শকের মন জয় করে। 'ডাকঘর' নাটকের আবেদন চিরন্তন— এটি তরুণ প্রধানের নির্দেশনায় ষড়ভুজ পরিবেশন করল ২৪ জানুয়ারি।

মেদিনীপুর কলেজ ছাত্র ইউনিটের পরিবেশনায় শ্যামলেন্দু ঘোষের নির্দেশনায় নাটক 'একটি অবাস্তব গল্প' শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বা ফাঁসির অসারতা প্রমাণ করে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেলার ও ম্যাজিস্ট্রেট নায়ক কমণ্ডলের ফাঁসি দেন। এদিনই পরিবেশিত 'অন্য থিয়েটার' বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'জগাখিচুড়ি' নাটক বর্তমান সর্বশিক্ষা প্রকল্পের বিশেষতঃ মিড-ডে-মিল ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এতে কার্যত শিক্ষককে রাঁধুনিতে পরিণত করা হয়েছে। ২৬ তারিখে সংস্তবের পরিবেশনায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ভূতনাথ নাটক দেখানো হয়। এটিও অন্যতম বাস্তবধর্মী সামাজিক নাটক।

শহরের প্রদ্যোত স্মৃতিভবনে প্রদর্শিত এমন নাটক দেখার সুযোগ বিশেষ হয় না। কেরানী জীবনের যন্ত্রণায় ভূতনাথের ভূমিকায় পার্থসারথি চন্দের অভিনয় অন্য মাত্রা পেয়েছে। শেষদিনে প্রেক্ষাগৃহ প্রায় দর্শকপূর্ণ ছিল

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকার পরিভ্রমণ

গত ২৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তা আক্কা নতুন দায়িত্ব লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে গেলেন। ১৯ ডিসেম্বর সমিতির কার্যকর্ত্রীসহ সেবিকাদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ২০ ডিসেম্বর সকালে শাখায় মিলিত হন।

২১ ডিসেম্বর উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে সমিতির সেবিকা ও কাযকর্ত্রীগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। সন্ধ্যায় সমিতির সেবিকারা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিবেকানন্দ স্মরণ অনুষ্ঠান করেন। ২২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির সেবিকা কার্যালয়ে সেবিকাদের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর মাধব ভবনে সমিতির সেবিকা ও কার্যকর্ত্রীগণ তাঁকে সংবর্ধনা জানান। ২৩ ডিসেম্বর দার্জিলিং ভ্রমণ করে ভগিনী নিবেদিতার সমাধিস্থলে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এবং পরে দার্জিলিং ও পাহাড় অঞ্চলের সঙ্ঘের ও সমিতির দায়িত্ব প্রাপ্ত কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে নিবেদিতার সমাধিক্ষেত্রের জীর্ণোদ্ধার করার সংকল্পে একটি সমিতি গঠন করা হয়।

শান্তা আক্কার ভ্রমণকালে সঙ্গে ছিলেন অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর, পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর, প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার ও প্রচারিকা জয়া ভট্টাচার্য।

মঙ্গলনিধি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার দক্ষিণ হরকুলি গ্রামের বাসিন্দা অচিন্ত্য কুমার মাইতি তার পুত্র সুব্রত মাইতির বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গলনিধি স্বরূপ ২০ হাজার টাকা সেবা কাজের জন্য সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহের হাতে তুলে দেন।

***

গত ১৯ জানুয়ারি সঙ্ঘের বসিরহাট মহকুমা ব্যবস্থা প্রমুখ রণজিৎ কুমার দালাল ও গন্ধর্বপুর শাখার স্বয়ংসেবক গোবিন্দ সরকার তাদের পুত্রদের বিবাহ উপলক্ষে বধূবরণ অনুষ্ঠানে সামাজিক কাজের জন্য ১০০১ (এক হাজার এক) টাকা করে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। সঙ্ঘের পক্ষে বিভাগপ্রচারক আশীষ মণ্ডল ও সহবিভাগ প্রচারক সঞ্জয় মণ্ডল এই মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন।

***

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের হাওড়ার শিবপুর শাখা সমিতির সদস্য শম্ভুনাথ হালদার তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শুভাশিস এবং পৌষালীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী ও পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমকে ১০,০০০ টাকা সামাজিক কাজের জন্য প্রদান করেন।

উক্ত অর্থ সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বপন নাগ ও কাঞ্চন ভট্টাচার্য গ্রহণ করে।

SATYA NARAYAN ACADEMY
C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.
CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765
ADVT.

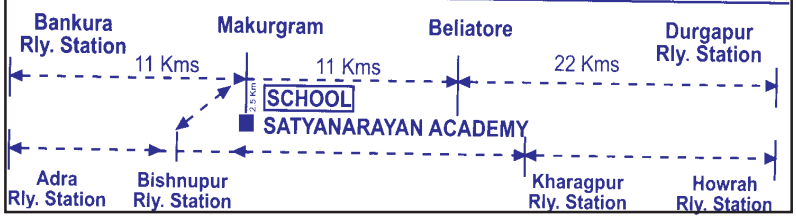

সমাজে বিলুপ্ত ক্রীড়া-সংস্কৃতি

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধূলা ও জীবন সমার্থক। আদিমকাল থেকেই মানুষ জড়িয়ে আছে নানা ধরনের খেলা ও শরীরচর্চার সঙ্গে। জ্ঞানত বা অজান্তে শৈশবকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ত। সাধারণত যেসব খেলার সঙ্গে

তারা জড়িয়ে নিত নিজেদের জীবন তা মূলত লোকক্রীড়া। একদা আমাদের বাংলায় এই ধরনের লোকক্রীড়া খুব জনপ্রিয় ছিল। এখন আধুনিক সব খেলার প্রভাবে এই লোকক্রীড়া সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে একপ্রকার। এমনকি গ্রামবাংলা যা কিনা নানা লোকক্রীড়ার আঁতুড়ঘর, সেখানেও একই ছবি। এই সাইবার যুগে গ্রামবাংলার যুবমানসে জুড়ে আছে মোবাইল, কমপিউটারের মতো বিত্তশালীদের খেলা ক্রিকেট। আর কিছুটা হলে ফুটবল, ভলিবল। অ্যাথলেটিক্সকে বলা হয় 'মাদার অব অল স্পোর্টস।' আদিমকাল থেকেই মানুষ অ্যাথলেটিক্স করে আসছে। তবে তা খেলার নিরিখে নয়। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষকে কখনও ছুটতে কখনও বা লম্ফঝম্ফও করতে হয়। প্রকারান্তরে যা অ্যাথলেটিক্সেরই নামান্তর। আদিমকালে বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে এই দৌড়, লাফের প্রয়োজন ছিল আদি মানবের। পরে তা অ্যাথলেটিক্সের ফরম্যাটে প্রাচীন অলিম্পিয়াডের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরকমই ভাবেই মানুষ জীবন ও প্রাকৃতিক কারণেই সাঁতার শিখে নেয়। পরে সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ মাছ ধরা, স্নান করার নিমিত্ত নানা জৈবিক কারণে নদী বা পুকুরে সাঁতার কাটতে বাধ্য হয় যা এখনও চলে আসছে গ্রামবাংলায়। আর শহুরে শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে- মেয়েদের কাছে সাঁতার শেখা স্ট্যাটাস সিম্বল। অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার আধুনিকতা নিয়ে শহর, গ্রাম সর্বত্র বেঁচে থাকলেও হারিয়ে গেছে অনেক খেলা।

একদা পল্লীবাংলার রোমাঞ্চকর খেলা ছিল লাঠিখেলা। তখন লাঠি খেলার প্রতিযোগিতাও হোত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই লাঠিখেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রয়েছে। অনেক বিপ্লবী খুব উঁচু মানের লাঠিয়াল ছিলেন। পুলিনবিহারী দাস তো 'লাঠি হাতে বিপ্লবী' হিসেবেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। স্যার গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনেও গুরুত্ব পেয়েছিল লাঠিখেলা। তখন পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবে বা আখড়ায় লাঠিখেলা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল যা আজ ইতিহাস। বাংলার আর একটি পুরনো ও জনপ্রিয় খেলা ছিল নৌবাইচ। উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, বসিরহাট, বনগাঁ, গাইঘাটা অঞ্চলেই নৌ-বাইচের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। নিয়মিত নৌ-বাইচের প্রতিযোগিতাও হোত। অংশ নিত একটি গ্রামের বিরুদ্ধে আর একটি গ্রাম। মূলত অভিজাত সমাজই এই খেলাটার পৃষ্ঠপোষকতা করত।

লোকক্রীড়া বা বাংলার প্রাচীন খেলার কথা বলতে গেলে অনেক নামই উঠে আসে। একদা বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকক্রীড়া ছিল হা-ডু-ডু। এই খেলাটা শুধু বাংলা নয়, ভারতের অনেক রাজ্যেই হোত। তবে বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে। যেমন পাঞ্জাবে 'মাঝরখানা', মহারাষ্ট্রে 'ইতুত'। মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে 'চেভুগুডু'। তবে হা-ডু-ডু পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি। বর্তমানে কবাডি রূপে একটু পরিমার্জিত সংস্করণ হয়ে এশিয়াডের অন্তর্ভুক্ত। আর দুই দশক ধরে এশিয়াডে ভারতই কবাডির রাজা। অবশ্য দাঁড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, এক্কাদোক্কা, বাঘবন্দী, কিত-কিত এসব খেলার নাম শুনলে আজকের শিশু-কিশোর-যুবা প্রজন্ম চোখ কপালে তুলবে। ভাববে এসব খেলা কি গ্রহান্তরের জীবেরা খেলত। আর মফস্বল তো বটেই অজ পাড়াগাঁয়েও কেউ বিশেষ একটা খেলে না একদা জীবনচর্চার অন্তর্গত এসব লোকক্রীড়া। অথচ এইসব খেলায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতা, স্ট্যামিনা সবকিছু লাগে যা জীবনে চলার পথে অনেক কাজে লাগে। এমনকি বেড়ে যায় দৃষ্টিশক্তিও। যান্ত্রিক সভ্যতা গিলে ফেলেছে এই খেলা। এসব খেলার মতো একদিন হয়ত হারিয়ে যাবে হা-ডু-ডু, খোখো-র মতো গ্রামীন খেলাগুলিও। কারণ ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস বা নিদেনপক্ষে হকির মতো আর্থিক ও মিডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা নেই। যতই কবাডিতে ভারত এশিয়াড সোনা জিততে থাকুক না কেন। অধিকাংশ কবাডি ক্লাব ধুঁকছে। হাতে গোনা কয়েকটি ক্লাবে ছেলে-মেয়েরা আসে খেলাটি শিখতে। এদের নিয়েই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাংলা দল গঠিত হয়, দেশের সেরা হয়। অবশ্য মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থানে মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট স্তরে চর্চা হয়। তাই ইদানিংকার ভারতীয় দলে স্থান পাচ্ছে ওইসব প্রদেশেরই সিংহভাগ ছেলে-মেয়ে। তবে কবাডি টিমটিম করে টিকে থাকলেও অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়ে গেছে খো-খো। খেলাটির রাজ্য বা জাতীয় সংস্থা কারুরই বিশেষ হেলদোল নেই কি করে এর পুনরুজ্জীবন ঘটানো যায় সে ব্যাপারে। নাগরিক সমাজে ব্রাত্য, এখন গ্রাম প্রত্যন্তেও অন্তজ শ্রেণীভুক্ত খেলা খো খো। অথচ উন্নত ও শক্তিশালী জীবন গঠনের উপযোগী সব গুণই আছে এই খেলাটির মধ্যে।

শব্দরূপ-৬৫৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

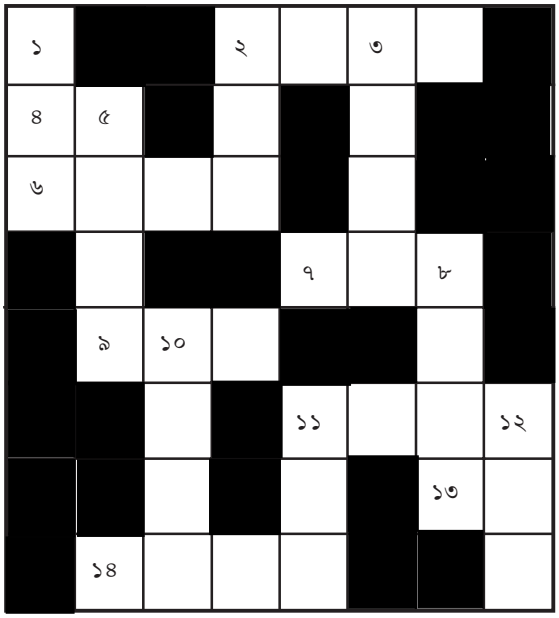

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. রাবণমহিষী, ৪. একই শব্দে প্রতিলিপি, নকল, বানর, শাক বিশেষ, ৬. মাসী, মাতার ভগিনী, ৭. বিষময় বীজ বিশেষ, (ঔষধ) ৯. চর্তুবর্ণের দ্বিতীয় জাতি, ১১. নারিকেলের অর্ধচন্দ্রাকার মিষ্টান্ন বিশেষ, ১৩. প্রচারিত হওয়া, ১৪. "দেখো, দেখে— আঁখি মেলে চায়"; শুক্রগ্রহ।

উপর-নীচ : ১. চাপরাস, মেডেল, ২. বাসুকির ভগিনী,সর্পের দেবী, ৩. হাস্যে দন্তের সৌন্দর্য, ৫. আশ্বিন-শুক্লপক্ষের পূর্ববর্তী কৃষ্ণপক্ষ, ৮. সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান, ১০. বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, ১১. রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের আত্মত্যাগিনী নায়িকা; ছিদাম-এর স্ত্রী, ১২. তরল পদার্থের ওজনের মাপ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৫৪
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

সু	ষ্ঠু	■	ভা	নু	ম	তী	■
জা	■	■	গ্যি	■	র	■	■
তা	ম	র	স	■	মি	■	■
■	রী	■	■	গো	য়া	ল	■
■	চি	রা	গ	■	■	ল	■
■	■	মা	■	হ	রি	না	ম
■	■	ই	■	ড়	■	■	ল্লি
■	শ	ত	রূ	পা	■	কে	কা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৫৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ মার্চ, ২০১৩ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২৮

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

SRISTI

COMPUTER SAKSHARATA MISSION

SCSM™

IT Education

An ISO 9001 : 2008 certified Organization

ভারত সরকারের দ্বারা অনুমোদিত

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য
কম্পিউটার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স

Computer Courses by SCSM

- Basic ◆ Internet
- FA ◆ D.T.P.
- Hardware
- Multimedia
- Teacher Tranning Courses
- Web Page Designing
- Video Editing& Mixing
- Mobil Reparing

100% Job Garantee Teacher Tranning Courses

সার্টিফিকেট সারা ভারতবর্ষে গ্রহণ যোগ্য।

Distance Courses

- BA, MA,
- B.Com, M.Com,
- B.Sc. , M.Sc.
- BSW, MSW
- B.Lis, M.Lis
- BCA, MCA,
- BBA, MBA
- BSc.-IT, MSc.-IT

B.ED. (Regular)

NIOS থেকে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

Garia, N-11, Srinagar Main Road,
Kol-700094 ◆ PH-9933967518

Computer Sales & Services

Website: WWW.SCSM.CO.IN